জনশিক্ষা ভাবনা

কেন এই পত্রিকা?

সারা ভারত জুড়ে এখন চলছে জনশিক্ষার অভিযান। চলছে সাক্ষরতার নানা প্রয়াস। আমাদের রাজ্যেও এই অভিযানের মাধ্যমে সাক্ষর হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁদের সচেতনতা বাড়ছে, দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। এঁরা যদি আরও এগিয়ে চলার গতিপথ না পান, এঁদের উদ্বুদ্ধ চিন্তাশক্তি যদি বিশ্লেষণী ক্ষমতায় শাণিত না হয়ে ওঠে, তবে এঁদের সৃজনশীলতা প্রায় শূন্যতায় পর্যবসিত হবে। সাক্ষরতা বাড়বে, কিন্তু সমাজ স্থিতাবস্থায় থাকবে। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হাজার বছরের পুরোনো মতকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে। এ থেকে মুক্তির জন্য চাই চিন্তার তীক্ষ্ণতা, ভাবনার স্বচ্ছতা, চাই প্রবহমান শিক্ষার এক নিরন্তর স্রোত। এই পত্রিকা হয়ে উঠবে এ সম্পর্কে মত-বিনিময় ও বিতর্কের একটি মঞ্চ — এই আমাদের আশা।

কীভাবে রচনা পাঠাবেন?

সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত আছেন, তাঁদের কাছে এই আন্দোলনের নানা দিক সম্বন্ধে রচনা পাঠাবার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। সাদা কাগজের একদিকে পৃষ্ঠার ডানদিকের দুই তৃতীয়াংশে স্পষ্টাক্ষরে নাতিদীর্ঘ লেখা চাই। প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদকমণ্ডলীর বিবেচনাকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করতে হবে। প্রকাশিত রচনাগুলিতে যে মত ব্যক্ত হয়, তা লেখকের নিজস্ব। সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মতের মিল নাও থাকতে পারে।

কীভাবে গ্রাহক হবেন?

বছরের যে কোনো সময় থেকে পত্রিকাটির গ্রাহক হওয়া যায়। বছরে চারবার এটি প্রকাশিত হয়। সরাসরি নিলে প্রতি সংখ্যার মূল্য দশ (১০.০০) টাকা। নিম্ন ঠিকানায় ডাকযোগে টাকা পাঠিয়েও গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক সডাক গ্রাহক মূল্য চল্লিশ (৪০.০০) টাকা। দুই, তিন বা চার বছরের গ্রাহকও হওয়া যায়। এক কালীন এক হাজার (১০০০.০০) টাকা জমা দিয়ে পত্রিকাটির আজীবন গ্রাহক হওয়া যায়।

কর্মাধ্যক্ষ, ত্রৈমাসিক পত্রিকা বিভাগ
সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতি
২৫/২, বারোয়ারিতলা রোড
কলকাতা - ৭০০ ০১০
দূরভাষ ঃ ২৪৭৭-০৩১৭

'সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতি' কেন?

জনশিক্ষার জগতে অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব সত্যেন মৈত্রর নামাঙ্কিত আমাদের প্রতিষ্ঠান 'সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতি'। গত ৬ এপ্রিল ২০০০ তারিখে ট্রাস্ট হিসাবে এই সমিতি সরকারিভাবে নিবন্ধীকৃত হয়েছে।

৫ জুন ১৯৯৬ তারিখে সত্যেন মৈত্র প্রয়াত হবার পর তাঁর স্মৃতি ও আদর্শকে অম্লান রাখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আমরা বিশেষভাবে অনুভব করি। সত্যেন মৈত্রর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমরা পেয়েছি। তাঁর কাছে আমরা শিখেছি, তাঁর নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে ও আদর্শ নিষ্ঠায় আমরা প্রাণিত হয়েছি। তাঁর স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন আমরা বোধ করেছি। তাঁর আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখা ও বিকশিত করাকে সমাজ-স্বার্থের একান্ত অনুকূল বলে আমরা মনে করেছি। তাঁর গুণমুগ্ধ ও জনশিক্ষায় আগ্রহী বহু মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতায় কয়েক বছর আগেই আমাদের সমিতির সূচনা হয়েছে। বেশকিছু কাজ আমরা ইতিমধ্যেই আরম্ভ করেছি। চারটি মূল লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যেতে চাইছি ঃ

(১) সত্যেন মৈত্রর স্মৃতি রক্ষা।

(২) জনশিক্ষার চলমান কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ।

(৩) জনশিক্ষা সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ।

(৪) গবেষণামূলক কাজ।

এই লক্ষ্য সাধনের ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত শুভানুধ্যায়ীর সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করি।

জনশিক্ষা ভাবনা

দ্বিতীয় বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০৫

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

চলব মোরা সমুখ পানে

সময় এগিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরাও। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজ গড়ে তুলতে আমরা দায়বদ্ধ। সেই দায়বদ্ধতাই আমাদের প্রেরণার উৎস। তাই চলার পথে আমরা বার বার স্মরণ করি অতীতকে। বিশেষ বিশেষ দিনগুলিকে আমরা বিশেষ ভাবে পালন করি। সেই উপলক্ষ্যে হিসেব নিকেশ করি আমাদের অগ্রগতির। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির। আগামী দিনে সেই আলোচনাই আমাদের দিশারি হয়ে ওঠে।

১৯৬৫ সালের তেহেরান সম্মেলনে, ৮ সেপ্টেম্বর তারিখটিকে প্রতি বছর বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস হিসেবে পালন করার ডাক দেয় ইউনেস্কো। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে গোটা পৃথিবী জুড়েই বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়। আমাদের রাজ্যেও সরকারের জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের উদ্যোগে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে সুসজ্জিত মিছিল ও সবশেষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই দিনটি পালন করা হয়। অন্যান্য বছরের মতো এ বারেও আমাদের সদস্য ও অনুরাগীরা বহুবিধ প্ল্যাকার্ড সহকারে এক বর্ণাঢ্য মিছিল নিয়ে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও শিক্ষাবিজ্ঞানী পাওলো ফ্রেইরির জন্মদিন উপলক্ষে ১৯ সেপ্টেম্বর গতবারের মতো এবারও আমাদের ইণ্ডিয়ান পাওলো ফ্রেইরি ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গণমাধ্যম কেন্দ্রের সহযোগিতায় একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল 'জনশিক্ষায় জনসংযোগ—ফ্রেইরীয় ভাবনা'। এই আলোচনা সভায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত বিশিষ্ট জনশিক্ষাবিদ্‌রা যোগ দেন।

প্রধান বক্তা বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির কার্যকরী সভাপতি বিমান বসু তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে ফ্রেইরীয় দর্শনের বিভিন্ন দিক, দেশবিদেশে জনশিক্ষার অতীত ও বর্তমান এবং এদেশে জনশিক্ষা বিস্তারে প্রবাদ পুরুষ সত্যেন মৈত্রের অবদান সম্বন্ধে আলোকপাত করেন।

মন্ত্রী নন্দরানি ডল, সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য, ত্রিপুরার অজয় ভট্টাচার্য, উড়িষ্যার চন্দ্রিকা মহাপাত্র কেরালার ড. ভি. রেঘু প্রমুখ বিভিন্ন রাজ্যে জনশিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন।

জলধর মল্লিকের Paulo Freire : His Life, Work and Thought শীর্ষক বইটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন বিমান বসু।

জীবনানন্দ সভাঘরের স্বল্প পরিসরে প্রায় দেড়শো লোকের উপস্থিতিতে, অত্যন্ত মনোগ্রাহী এই সভায় অর্ধেক লোকই বসার জায়গা পাননি। তবু তাঁদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও আলোচনা শোনার আগ্রহ থেকেই এই আলোচনা সভার সার্থকতার দিকই ফুটে

ওঠে। এঁদের ঐকান্তিকতাই আমাদের চলার পথের পাথেয়।

এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলি কাজ করে স্মারক হিসেবে। স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের দায়বদ্ধতার কথা। এগিয়ে আমাদের যেতেই হবে। There is no boat to return.

পত্রিকার গত সংখ্যাটি 'বর্ণপরিচয় বিশেষ সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। 'বর্ণপরিচয়'-এর দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা বছর ধরেই আমরা এই ধরনের কিছু লেখা প্রকাশ করতে চাই। এগুলি আমাদের আত্মসমীক্ষার সুযোগ করে দেবে। এর মাধ্যমেই আমরা বাধা ডিঙিয়ে এগিয়ে চলার দৃঢ়তা অর্জন করতে পারব। তত্ত্ব এবং প্রয়োগের চর্চা চলুক অবিরাম। সম্পূর্ণ হোক নিরলস পর্যানুশীলনের বৃত্ত। Praxis-এ কোনো যতি চিহ্ন নেই।

"সাক্ষরতা—সচেতনতা—সক্ষমতার" জন্যে লড়াইয়ে অসাধারণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সত্যেন মৈত্র চেয়েছিলেন প্রতিটি সাক্ষরতা কেন্দ্রই যেন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সাক্ষরতা কেন এবং কীভাবে সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, স্বল্পপরিসরে তার বিশদ ব্যাখ্যা কিছুটা হলেও আমরা পাই এই সংখ্যায় শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের লেখা নিবন্ধটিতে। অধুনা বহু ঢক্কানিনাদিত 'সকলের জন্যে শিক্ষা'-র অন্তর্নিহিত চরিত্রটি যে কী তার একটা সর্বজনবোধ্য রূপরেখা ফুটিয়ে তুলেছেন আফজল হোসেন। ফ্রেইরীয় তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আমরা কাজ করছি। সেই তত্ত্ব প্রয়োগের প্রথম যুগের কিছু চিত্র আমাদের সামনে হাজির করেছেন মিহির ঘোষ দস্তিদার। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একটু ক্ষোভের সঙ্গেই নতুন আঙ্গিকে কিছু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন সুনীল দত্ত। প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্রের মূল্যায়ন এরাজ্যে প্রথম হল হুগলি জেলায়। রাজ্যে প্রথম সেই মূল্যায়নের দুর্লভ অভিজ্ঞতা এই সংখ্যায় পেশ করেছেন একজন মূল্যায়নকারী। প্রবহমান শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কর্মীর কাছে অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ময়দান থেকে সরাসরি পাঠানো সোঁদা গন্ধ মাখা এই প্রতিবেদনটি অবশ্যই একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

আশা করি তত্ত্ব, তথ্য, অনুশীলন, প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনাপুষ্ট বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বিভিন্ন স্বাদের লেখাগুলি অবশ্যই আমাদের পাঠককুলকে তথা জনশিক্ষা আন্দোলনের অগ্রণী কর্মীদের দাবির পরিপূরক হয়ে উঠবে। শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা বিশেষত সাফল্যের কাহিনি (Case Study), সমীক্ষালব্ধ তথ্য আমাদের লিখে পাঠান। তাঁদের অভিজ্ঞতা আমরা ভাগ করে নিতে চাই। এছাড়া পাঠকদের কাছ থেকে, আমরা পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জানতে চাইছি। খোলামেলা গঠনমূলক সমালোচনা করুন। সবশেষে আবার আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই, নিজেদের যোগ্যতায় সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে দিনের পর দিন। এখানে কোনো আপস নেই। পর্যানুশীলনে কোনো কারণেই যেন যতিচিহ্ন না আসে। হ্রাস না পায় তার গতিবেগ। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের-একাগ্রতায় যেন কখনো ঘাটতি না পড়ে। তবেই তো আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারব চলব মোরা সমুখ পানে।

সাক্ষরতা ও সংস্কৃতি

শঙ্কর মুখোপাধ্যায়

নিবন্ধের শিরোনামটি দেখে প্রশ্ন উঠতেই পারে সাক্ষরতা এবং সংস্কৃতি নামক আলাদা দুটি বিষয়ের মাঝখানে ও অক্ষরটি বসিয়ে জোড়া দেবার চেষ্টা সঠিক নয়। কারণ, বিষয় দুটি আলাদা নয়। হ্যাঁ ঠিকই, বিষয় দুটি আলাদা নয়। সামগ্রিক অর্থে সংস্কৃতি বলতে গোটা জীবনচর্যাকেই বোঝায়, সাক্ষরতা তথা শিক্ষা আন্দোলন তারই একটা অংশ। তবে আমরা যেহেতু সংস্কৃতি বলতে ক্ষুদ্র অর্থে উপস্থাপনযোগ্য শিল্প (Performing art) অর্থাৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিকেই বুঝি সেই সূত্রে সাক্ষরতা আন্দোলনের জন্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকা বা সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলির বিকাশে সাক্ষরতা আন্দোলনের ভূমিকা আলোচিত হতেই পারে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে সাক্ষরতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আমার যা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে তাকে ভিত্তি করেই এই আলোচনার সূত্রপাত। বর্তমান পর্যায়ের সাক্ষরতা আন্দোলন যখন ১৯৯০ সালের শেষ ভাগে শুরু হয়েছিল সে সময় কেউ ভাবতে পারেনি উপরের শিরোনামের বিষয়বস্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ভাবতে পারেন নি সংস্কৃতি আন্দোলনের কর্মীরা, এমন কী সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মীরাও। এখন তাঁরা সকলেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করছেন। বিশেষত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীরা এই কর্মসূচির অন্য দিকগুলিও বোঝার চেষ্টা করছেন। সাক্ষরতা আন্দোলনে শিল্পী তথা লোকশিল্পীদের ভূমিকা অনুধাবন করা শুধুমাত্র নয়, সামগ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সাক্ষরতা কর্মসূচির ভূমিকা নিয়েও তারা গভীরভাবে ভাবছেন।

বর্তমান পর্যায়ে সাক্ষরতা কর্মসূচি ৯০-৯১ সালে শুরু হলেও এটাই শুরু নয়। ৩০ এর দশকে বা ৭০ এর দশকে কৃষক ছাত্র এবং যুব আন্দোলনের কর্মীরা তাঁদের নিজেদের মূল আন্দোলনের তথা শোষণ-মুক্তির সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে সাক্ষরতা আন্দোলনকে গ্রহণ করে তাকে সফল করার কাজে সে সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেদিনের সাক্ষরতা আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মসূচিও ছিল মূল আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। সাক্ষরতা কর্মসূচির জন্যে পরিবেশ রচনা, পড়ুয়াদের উৎসাহ দান — এ সব তো ছিলই, প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মূল সংগ্রামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া, আর ছিল অপসংস্কৃতির আক্রমণকে প্রতিহত করা। এই কাজের হাতিয়ারটা যেহেতু ছিল সাংস্কৃতিক হাতিয়ার অর্থাৎ নাটক, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি, সেহেতু সাক্ষরতা আন্দোলনের প্রয়োজনটুকু মিটিয়েই সেগুলি ফুরিয়ে যায়নি। আরও এক ধাপ এগিয়ে আন্দোলনের কর্মীদের গ্রামের গরিব নিরক্ষর মানুষদের আপনজন বানিয়ে দিয়েছিল। সে সময়ের উদ্যোগ সবটাই ছিল বেসরকারি উদ্যোগ, সমাজ বদলের আন্দোলনের নানা ধরনের কর্মীদের যৌথ উদ্যোগ। তখনকার সরকার চাইত না সাক্ষরতার প্রসার হোক।

শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটাই স্বাভাবিক। সরকারি কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ বা আমলাদের কেউ কেউ হয়তো এই কাজ সমর্থন করতেন, কিন্তু গোটা সরকারি নীতি কাগজে কলমে যাই হোক, কাজে কর্মে ছিল সাক্ষরতা প্রসারের বিরোধী। সরকার আর তার পৃষ্ঠপোষক বড়ো বড়ো জমির মালিক, কলকারখানার মালিকেরা, কৃষক, শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের যে চোখে দেখত সেই একই চোখে দেখতো সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মীদের। জোতদারদের লেঠেল বাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলা করে কৃষককর্মীদের যেমন আন্দোলন করতে হত, মালিকের ভাড়াটে গুন্ডা বাহিনীর মোকাবিলা করে যেমন শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের আন্দোলন করতে হত, সর্বোপরি পুলিশের লাঠি গুলি জেল এসবের মোকাবিলা করে যেমন এদের সবাইকে আন্দোলন করতে হত, তেমনি একই ভাবে সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মীদেরও লাঠির মোকাবিলা করেই কাজ করতে হত। সে দিন দিনবদলের গানই ছিল সাক্ষরতার গান, দিনবদলের নাটকই ছিল সাক্ষরতার নাটক। আলাদা নাটক গান লেখার প্রয়োজনীয়তাও সেভাবে অনুভূত হত না, তেমন সম্ভাবনাও ছিল না।

বর্তমান পর্যায়ের সাক্ষরতা আন্দোলনের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ৯০ সালে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি, তৈরি হয়েছে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন, তৈরি হয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে আলাদা বিভাগ, বিশেষ দায়িত্ব পেয়েছেন নির্দিষ্ট মন্ত্রী, বরাদ্দ হয়েছে সরকারি অর্থ, আর খোদ কেন্দ্রীয় সরকার বা অন্য কোনো রাজ্য সরকার যেভাবেই গ্রহণ করে থাকুক পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এই বিষয়টিকে তার সামগ্রিক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির, মানব সম্পদ উন্নয়নের কর্মসূচির এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেই গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকার আন্তরিক ভাবেই চায় এই কর্মসূচির সাফল্য। প্রায় সব গণ-সংগঠনই সাক্ষরতার কাজটিকে তাদের প্রধান কাজগুলির অন্যতম বলে গ্রহণ করেছে। অনেকেই সংগঠিত ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এই কাজে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এ এক সর্বাত্মক যুদ্ধ। সংস্কৃতি কর্মীরাও পিছিয়ে থাকেননি, যোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন তাঁরা। তার থেকেও বড়ো কথা এই কর্মসূচির কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক হাতিয়ারগুলোরও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা। নতুন জীবন গড়ার সংগ্রাম বহুমাত্রিক সংগ্রাম, কারণ জীবন বহুমাত্রিক; সাক্ষরতার সংগ্রাম সেই বহুমাত্রিক জীবনসংগ্রামের একটি অংশ, গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই কারণেই লিখতে হয়েছে আলাদা করে সাক্ষরতার গান, নাটক; এই কারণেই তাদের জড়ো করতে হয়েছে আরও অনেক শিল্পী বিশেষ করে লোকশিল্পীদের। বহুমাত্রিক জীবন সংগ্রামের ময়দানে সাংস্কৃতিক আন্দোলনও নতুন মাত্রা পেয়েছে।

অন্যদিকে সাক্ষরতা আন্দোলনও এমন একটি প্রয়োজনীয় মাধ্যমের সাহায্য পেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে। পেরেছে মানুষের মধ্যে দ্রুত শিকড় গাড়তে। সাক্ষরতা আন্দোলনে সব থেকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারবেন সংস্কৃতি কর্মীরা, এটা গোড়াতেই বোঝা গিয়েছিল। আর সংস্কৃতি কর্মীরাও এটা গোড়াতেই বুঝেছিলেন একাজ শুধুমাত্র সংগঠিত শিল্পীদের দিয়ে হবে না, কাজে লাগাতে হবে সংগঠিত অংশের বাইরে রয়েছন এমন অসংখ্য শিল্পীদের বিশেষ করে লোকশিল্পীদের। তাঁরা আরও বুঝেছিলেন

যে, যে মানুষগুলোর জন্যে তাঁদের নাটক, গান লিখতে হবে সেই নিরক্ষর মানুষগুলো সমাজের সব থেকে অবহেলিত অংশের মানুষ। আর তাঁরা বেশির ভাগই বাস করেন গ্রামে। তাঁদের ভাব প্রকাশের ভঙ্গি, তাঁদের রসচেতনা, তাঁদের প্রাণের টান সবটাই শহরের মানুষদের মতো নয়। প্রচলিত ছকেবাঁধা নাটক, গান বিশেষ কাজে লাগবে না। সংস্কৃতি কর্মীদের তাই নতুন ভাবে লিখতে হয়েছে, নতুন করে লিখতে হয়েছে; লোকশিল্পীরা, যাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই একাজ সাবলীল ভাবে করতে পারেন, তাঁদের লেখাতে, সৃষ্টি করতে উৎসাহিত করতে হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে সাক্ষরতা আন্দোলনের জন্যে প্রয়োজন ছিল দুধরনের প্রচার কর্মসূচির। প্রথমত পরিবেশ রচনা করার উপযোগী, দ্বিতীয়ত নিরক্ষর মানুষদের উৎসাহিত করার উপযোগী। এই দুধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রচারের ধরনও ছিল ভিন্ন, প্রচারের সাংস্কৃতিক হাতিয়ারগুলোও ছিল ভিন্ন, প্রচারের সাংগঠনিক রূপটিও ছিল ভিন্ন। প্রথমত ব্যাপক অংশের মানুষকে উৎসাহিত করার জন্যে, সামগ্রিক পরিবেশ রচনা করার জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছিল সব ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংগঠিত করার কাজকে। নাট্যদল, নাট্যকার, সঙ্গীতকার, সঙ্গীতদল, শিল্পী—সবাইকে জড়ো করে সভা করা হয়েছিল, সাক্ষরতা আন্দোলনের মর্মবস্তু জানাবার জন্যে হাজার হাজার আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল, কেন্দ্রীয় ভাবে কর্মশালা করে নাটক, গান তৈরি করে ছেপে বা ক্যাসেট-বদ্ধ করে হাজার হাজার কপি বিলি করা হয়েছিল, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে দীর্ঘপথে সাংস্কৃতিক প্রচার জাঠা একাধিক বার আয়োজন করা হয়েছিল। এর সাথে মঞ্চে-মাঠে-হলে পথে পথে নাটক গানের অনুষ্ঠান, মানব-বন্ধন, মিছিল, পোস্টার ব্যানার, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, মশাল দৌড়, এক কথায় সব ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছিল। সাংস্কৃতিক কর্মীরা সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে একাজ করেছিলেন।

দ্বিতীয় ধরনের প্রচার কিন্তু চরিত্রগতভাবে ভিন্ন। এই প্রচার আরও নিবিড়, নিরক্ষর মানুষদের মনের জ্বালাকে উস্কে দেবার জন্যে আসল কথাটি খুঁজে বের করে তাঁর প্রাণের সুরে, ভাবে, ভঙ্গীতে তাঁর ঘরের একদম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সেই কথা বলা। এজন্যে অনেক বেশি অনুষ্ঠানের দরকার, দরকার অনেক বেশি শিল্পীর, আর দরকার তেমন তেমন নাটক, গান। তেমন তেমন নাটক গান না হয় তৈরি করা গেল বা যোগাড় করা গেল, কিন্তু এতো শিল্পী, এতো নাট্য দল? শুধুমাত্র সংগঠিত শিল্পীদের কথা ভাবলে কাজটি অসম্ভব। কিন্তু যদি এমন পরিকল্পনা করা যায় যাতে সেন্টারে সেন্টারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নিরক্ষর, সদ্যসাক্ষর শিল্পীরা নিজেরাই হাতে তুলে নেন দোতারা, একতারা, ঢোল, হারমোনিয়াম, মাদল, ধামসা, যদি এঁদের সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সাক্ষরতা আন্দোলনের মর্মবাণী, তাহলেই সম্ভব এই বিশাল কাজ সমাধা করা। গোড়ার কাজটা সংগঠিত সংস্কৃতি কর্মীরা করেছেন, সবটা না পারলেও অনেকটা করেছেন আর যেটুকু তাঁরা করতে পেরেছেন তার গতি ধরেই বাকি অংশে গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

এ সময় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন লোকশিল্পীরা। সব ধরনের প্রচারের কাজে তাঁদের দায়িত্ব ছিল সব থেকে বেশি আর তাঁরা তা প্রাণপণে পালনও

সকলের জন্যে শিক্ষা : কোন শিক্ষা, কাদের জন্যে ?

আফজাল হোসেন

> "For me education is simultaneously an act of knowing, a political act and an artistic event. I no longer speak about a political dimension of education. As well, I don't speak about education through art. On the contrary, I say education is politics, art and knowing."
>
> —Paulo Freire.

'শিক্ষা' কথাটি ব্যাপক। অ, আ, ১, ২ দিয়ে শুরু; চলে জীবন ব্যাপী। আবার বর্ণ, সংখ্যা ছাড়াও আর এক রকমের শিক্ষা অভিজ্ঞতা থেকে হয়, যা বোধগত শিক্ষা। শিক্ষার এই ব্যাপকতা লক্ষ্য করে শিক্ষার ইতিহাসের এক বিশিষ্ট গবেষক সুরেশ চন্দ্র ঘোষ বলেছেন যে সাম্প্রতিক কালে শিক্ষার ধারণা উল্লেখযোগ্য ভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছে। শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র প্রথাগত বিদ্যালয় শিক্ষাকেই বোঝায় না, ব্যক্তির চরিত্র গঠনে এবং বৌদ্ধিক বিকাশে যেসব প্রভাব কাজ করে সেগুলিও শিক্ষার অঙ্গীভূত। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা সম্পর্কে ইউনেসকো-র আন্তর্জাতিক কমিশন শিক্ষার চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ উল্লেখ করে বৃহত্তর পরিসরে বলেছে যে নিজ লক্ষ্যে শিক্ষাকে যদি সাফল্য লাভ করতে হয়, তবে শিক্ষা অর্জনের চারটি মৌলিক বিষয়কে ঘিরে শিক্ষাকে সংগঠিত করতে হবে। এরকম শিক্ষাই একজন ব্যক্তির জীবন ব্যাপী জ্ঞানার্জনের স্তম্ভ হিসাবে কাজ করবে। প্রথমটি হল কীভাবে জানতে হয় তা শেখা (Learning to know)। এর অর্থ জানার কৌশলকে আয়ত্ত করা। দ্বিতীয়টি হল কীভাবে কাজ করতে হয় তা শেখা (Learning to do)। এর অর্থ হল নিজের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সৃজনশীল প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য অর্জন করা। তৃতীয়টি হল সমাজের সকলের সঙ্গে কীভাবে বসবাস করতে হয় তা শেখা (Leaning to live together)। এর অর্থ হল সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার দক্ষতা অর্জন করা। চতুর্থটি হল সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠা (Learning to be)। প্রথম তিনটি বিষয়ের আবশ্যিক পরিণতিই হল পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি মানুষ হয়ে ওঠা। শিক্ষার এই চারটি স্তম্ভ অবশ্যই অবিচ্ছেদ্য। কারণ এই চারটির সামগ্রিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। নিরক্ষর মানুষও শিক্ষিত হয়। কিন্তু তার এই শিক্ষা সীমিত—পূর্ণ হয় না। কারণ জানার এবং উপলব্ধির গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি, লেখাপড়া, তার আয়ত্তে থাকে না। বোধগত শিক্ষা পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়াও হয়। কিন্তু পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়া ব্যবহারিক জীবনে খুবই সীমিত পরিসরে সক্ষমতা অর্জন সম্ভব - ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক কোনও

ক্ষেত্রেই যা পুরো কার্যকরী হয় না। আশা করা হয়, পুঁথিগত শিক্ষা যত বেশি হবে বোধগত শিক্ষাও তত বেশি হবে।

'সকলের জন্য শিক্ষা'য় শিক্ষা কথাটি ন্যূনতম অর্থে ব্যবহৃত। ভারতে এই ন্যূনতম মান অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বা এই মানের শিক্ষা। এই ন্যূনতম মানের শিক্ষা না থাকলে মানুষ ব্যবহারিক জীবনে ইতিকর্তব্য নির্ধারণে সচেতনতা অর্জন করতে অসুবিধায় পড়ে, সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে স্বাধীন করতে পারে না। এটাই প্রচলিত ধারণা বলে এই শিক্ষার জন্যে এত তোড়জোড়। 'সকলের' কথাটিও অর্থবহ। সকলের জন্য শিক্ষার কথা যখন বলা হয়, তখন একথা বোঝায় না যে এ যাবৎ কাল কেউই শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এর অর্থ অনেকেই এ যাবৎ কাল শিক্ষা থেকে বাদ পড়েছে, এখন থেকে যেন আর কেউ বাদ না পড়ে। 'সকলের জন্যে' মানে এই বাদপড়া মানুষদের জন্যেও শিক্ষা, যাদের কাছে শিক্ষা পৌঁছোয় না অথবা যারা শিক্ষার কাছে পৌঁছোয় না। 'সকলের জন্যে শিক্ষা'র ধারণার মধ্যে অন্য একটা কথাও লুকিয়ে আছে—কিছু মানুষ লেখা পড়া শেখেনি বা শিখছে না। এই না শেখা মানুষদের ন্যূনতম শিক্ষার মানে নিয়ে আসবার জন্যে যেমন প্রথাগত বা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা আছে, পাশাপাশি আছে বিমুক্ত ব্যবস্থাও। 'সর্বশিক্ষা অভিযান' প্রকল্পে ৬-৯ বৎসরের শিশুদের জন্যে যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তেমনি আছে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। ৯-১৪ বৎসর বয়স্কদের জন্যে যেমন আছে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষা, তেমনি আছে মুক্ত বিদ্যালয়। বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্যে আছে সাক্ষরতা কেন্দ্র, সাক্ষরোত্তর কেন্দ্র, প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্র ও মুক্ত বিদ্যালয়।

Food for Work, Food for Education এবং Food for Thought:

এ যাবৎ কাল যাঁরা লেখাপড়া করছেন বা এখনও করছেন তাঁদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা যে কোনো বিনিময় মূল্যে শিক্ষাগ্রহণে সচেতন। বাস্তবে খুব ভালো শিক্ষার জন্যে খুব ভালো বিনিময় মূল্যও দিতে হয়। নামি এবং দামি স্কুলে ছাত্রভর্তির উৎকণ্ঠা এবং ভিড় থেকে একথা প্রমাণিত যে অনেকেই ভালো শিক্ষার জন্যে ভাল মূল্য দিতেও তৈরি। শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে বিজ্ঞাপন, প্রচার ইত্যাদি দরকার হয় না। ভর্তির বিজ্ঞাপনই যথেষ্ট। 'স্কুল চলো অভিযান' বা 'সাক্ষরতা, সক্ষমতা, সচেতনতা' তাদের জন্য নয়।

২০০১ সাল থেকে World Food Programme (WFP) - এর নেতৃত্বে ৬৩টি দেশে School Feeding Programme চলছে। ভারতে যার পোশাকি নাম Midday Meal প্রকল্প। সংস্থার কর্ণধার James Morris এক সাক্ষাৎকারে এই প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে একজন ক্ষুধার্ত মানুষের চিন্তা করবার কিংবা শারীরিক শ্রম করবার ক্ষমতা থাকে না। পক্ষান্তরে যে কোনো মানুষের ক্রমাগত সাফল্য তার শারীরিক শ্রম এবং চিন্তা করবার দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা (Food for Education) এক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। খাদ্যের অভাব শারীরিক, মানসিক ক্ষমতা হ্রাস করে। শিক্ষার প্রয়োজন প্রধানত সামাজিক অস্তিত্বের জন্যে, জৈবিক অস্তিত্বের জন্যে নয়। জৈবিক অস্তিত্বের জন্যে শিক্ষার প্রয়োজন নেই, অবশ্যই খাদ্যের প্রয়োজন

আছে। Food for Education - এক সঙ্গে দুটোই করছে। অভাবী ঘরের শিশুরা যাতে অন্তত একবেলা ভাল খেতে পারে এবং ঠাণ্ডা মাথায় পড়াশোনা করতে পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

তাহলে যাদের বাবা-মায়ের জন্য Food for Work কর্মসূচি, তাদের জন্যই প্রধানত Food for Education কর্মসূচি। একটা বৈপরীত্যও চোখে পড়ার মতো। শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই প্রান্তে রয়েছে একেবারে বিপরীত মেরুর মানুষ। একদিকে একদল যারা শিক্ষার কাছে যেতে ভয় পায়, গুরুত্ব বুজলেও সাধ্য নেই, পেটে ভাতও নেই। অন্য দিকে আর এক দলের সাধ্য এত বেশি যে দেশের বাইরে গিয়েও শিক্ষা গ্রহণে পিছপা হয় না। মাঝখানে নানা অবস্থানে কিছু মানুষ অবশ্যই আছেন। তবে প্রথম দলের সংখ্যাই অধিক। আর্থিক অক্ষমতা এবং তাকে ঘিরে নানা কারণে তাদের সচেতনতাও কম। ব্যতিক্রম সর্বদাই যেমন থাকে এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় না। দেখা গেছে যে Midday Meal চালু হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। অর্থাৎ খদ্যের মতো মৌলিক চাহিদাকে incentive হিসাবে ব্যবহার করে তবেই শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসা যায়, অন্যথায় নয়। প্রশ্ন আসে যে এই ব্যাপক মানুষের জন্যে যেমন ন্যূনতম শিক্ষার তোড়জোড় চলছে, তাদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যে সে পরিমাণ তোড়জোড় নেই কেন? তাদের শিক্ষা তাদের নিজেদের জন্যে নাকি, বড় হয়ে Food for Work - এর দক্ষ শ্রমিক গড়বার উদ্দেশ্যে বা ভোক্তার সংখ্যা বাড়াবার জন্যে কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে? সচেতন নাগরিকদের জন্যে বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ Food for Thought!

ভারতে ন্যূনতম শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা :

ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ সকল নাগরিকের ন্যূনতম শিক্ষার মোটামুটি একটা গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সংবিধানের চতুর্থ অংশের (যা আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য নয়) ৪৫ নম্বর ধারায় ঘোষিত হয়েছিল যে সংবিধান কার্যকরী হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে রাষ্ট্র ১৪ বৎসর বয়স্ক শিশুদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কয়েক দশক পেরিয়ে যাওয়ার পরও ভারত রাষ্ট্র এই নির্দেশ পালন করেনি। ১৯৯৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট জে. পি. উন্নিকৃষ্ণন বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য মামলায় এক যুগান্তকারী রায় দেন। এই রায়ে বলা হয় যে ভারতের নাগরিকদের ন্যূনতম শিক্ষা পাওয়ার মৌলিক অধিকার আছে। সংবিধানের ২১ নং ধারার বৃহত্তর পরিসরে তা অন্তর্ভুক্ত। তবে এই অধিকার চরম নয়, ৪৫ নম্বর ধারার আলোকে তাকে বিচার করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে ঘোষণা করবার দাবি উঠতে থাকে, যা ২০০১ সালে সংবিধানের ৯৩ তম সংশোধনী আইনের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ পায়। এই সংশোধনী অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের অংশে ২১ নং ধারার পরে ২১ক ধারা সংযোজন করে বলা হয়েছে ঃ "The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the state may, by law, determine." - ৪৫ নম্বর ধারাকে সংশোধন করে বলা হয়েছে ঃ "The state shall endeavour to provide early child-hood care and

education for all children untill they complete the age of six years" - সংবিধানের চতুর্থ - ক অংশের দশটি মৌলিক কর্তব্যের সঙ্গে আর একটি মৌলিক কর্তব্য সংযোজন করে বলা হয়েছে ঃ "Who is a parent or guardian is to provide opportunities for edcuation to his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years." - অবশ্য সংবিধানের মৌলিক কর্তব্য আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য নয়। আর একটি বিষয় উল্লেখ্য। শিক্ষা সংবিধানের সপ্তম তপশিলের যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এক্ষেত্রে স্বীকৃত। তবে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকাই অধিক।

সকলের জন্যেই একই শিক্ষা ?

সংবিধানের ৪৫ নম্বর ধারায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ন্যূনতম শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকার যেমন ঘোষিত হয়েছে, তেমনি স্বাধীনতার পর শিক্ষা সম্পর্কে সরকারি নীতিও নির্ধারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে S. Radhakrishnan -এর নেতৃত্বে, University Education Commission (1948), L. Mudaliar এর নেতৃত্বে Secondary Education Commission (1952), D. S. Kothari - এর নেতৃত্বে Education Commission (1964), National Policy of Education (1986) এবং তার Programme of Action (1992 সালে সংশোধিত) ইত্যাদি উল্লেখ্য। এ সবের উপর নির্ভর করে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নেরও চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সংবিধানের বিধান, কমিশনের সুপারিশ ও সেই অনুযায়ী সরকারি নীতি, এগুলি স্বপ্রযুক্ত নয়, এগুলিকে বাস্তবায়িত করতে হয়। তাছাড়া এগুলির খবর সমাজের গভীরে ও মর্মে প্রবেশ করে না কিংবা প্রবেশ করানো হয় না। তাই দেখা যায়, স্বাধীনতা লাভের ৫৮ বছর পরও খাদ্যের মতো মৌলিক চাহিদাকে Incentive হিসাবে ব্যবহার করে সব শিশুকে বুনিয়াদি শিক্ষার কাছে টানা যাচ্ছে।

চেষ্টা করে সকলকে শিক্ষার কাছে আনলেও সকলের জন্যে একই শিক্ষা কি সুনিশ্চিত করা যাচ্ছে? খাদ্যের বিনিময়ে যারা শিক্ষা নিচ্ছে এবং যারা চড়া মূল্যে শিক্ষা কিনছে উভয় দলের শিক্ষা হচ্ছে। কিন্তু একই শিক্ষা হচ্ছে না। গুণে, মানে অনেক তফাৎ। ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা, পরিকাঠামো, পরিচালন, পরিচলন ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে পার্থক্যের জন্যে শিক্ষার গুণেও বিস্তর ফারাক হচ্ছে। সুতরাং সকলের জন্যে শিক্ষা হলেও, সকলের জন্যে একই গুণ-মানের শিক্ষা হচ্ছে না।

বাদপড়া মানুষের শিক্ষা, ছাত্রবৃদ্ধি ও গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা—একটি চ্যালেঞ্জ ঃ

ইতিমধ্যেই উল্লখিত যে সকলের জন্য শিক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্যে শিক্ষা। যারা এগিয়ে আছে তারা নিজের চেষ্টায় আরও এগিয়ে যাচ্ছে। পিছিয়ে পড়া মানুষদের উৎসাহ দিয়ে, উদ্দীপনা সৃষ্টি করে শিক্ষার কাছে নিয়ে আসা হচ্ছে। সাক্ষরতা অভিযান, কিংবা সর্বশিক্ষা অভিযানের প্রভাবে, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার কল্যাণে, স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের জন্য গুণ-মান সম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা

করবার জন্যে চাই সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। যাদের নিয়ে আসা হল, তাদের গুণ-মান সম্পন্ন শিক্ষাদানের নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা অস্বীকার করবার উপায় আছে কি?

শিক্ষার গুরুত্ব কতটা?

ন্যূনতম শিক্ষার জন্যে বিশেষ উদ্যোগ এবং তার বাস্তবায়নের জন্যে চেষ্টার অর্থ হল শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া আজকের পৃথিবীতে সক্ষমতা অপূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু শিক্ষা কার্যকরী না হলে হারিয়ে যায় - তা যে শিক্ষাই হোক। তার জন্যে চাই পরিবেশ, জীবিকার সঙ্গে শিক্ষার যোগ। সব মিলে যদি একটি Learning Society তৈরি করা যায় তাহলে শিক্ষা চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়া যায়। এ সমাজে সকলে পরিবেশের তাগিদেই শিক্ষামুখী হবে। তা যদি করতে হয় তবে শিক্ষা যে সমাজে কার্যকর হবে তারও পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিবর্তন হচ্ছে - একথা ঠিক। কিন্তু পরিবর্তন কীভাবে এবং কার জন্যে হচ্ছে? বাদপড়া মানুষের শিক্ষা এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে চর্চিত হওয়ার সুযোগ পায় কি?

Jean Dreze এবং অমর্ত্য সেন ন্যূনতম বুনিয়াদি শিক্ষার পাঁচটি গুরুত্বের কথা বলেছেন : (১) শিক্ষার নিজস্ব গুণ অর্থাৎ শিক্ষা নিজেই নিজের লক্ষ্য; কোনও উদ্দেশ্য সাধনের উপায় না হলেও শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত হওয়াতেই ব্যক্তি নিজের মধ্যেই কিছু অনুভব করে, যার দ্বারা সামাজিক মেলা-মেশা, আত্মোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তি-হৃদয় থেকেই সাহস ও উৎসাহ পায়। (২) ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণের উপায়। জীবিকার জন্যে কাজ পাওয়ার সুবিধে, অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ লাভ। তাছাড়া খবরের কাগজ পড়া থেকে অনেক কিছু ব্যক্তি নিজেই করতে পারে—অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয় না। (৩) সামাজিক লক্ষ্যপূরণের উপায়। সমাজের মানুষ শিক্ষিত হলে, সমাজের যৌথ জীবনে চাহিদা পূরণে অনেক সুবিধে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা থেকে শুরু করে, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণরোধ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ, এড্‌স রোধ ইত্যাদি সুবিধেজনক হয়। (৪) সামাজিক প্রক্রিয়াগত সুবিধে। শিক্ষার প্রক্রিয়াগত দিক সামাজিক প্রক্রিয়াগত অসুবিধা দূর করতে সহযোগী ভূমিকা পালন করে। শিশুশ্রম প্রতিরোধ, সামাজিক মেলামেশার পরিধি বৃদ্ধি, মত বিনিময়েব অভ্যাস তৈরি ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। (৫) ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সম্পদের বন্টন। রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংঘবদ্ধতা, নির্যাতন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সমতার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এই সুবিধেগুলির প্রত্যক্ষ ফল ব্যক্তি ভোগ করলেও গোটা বিষয়টি সামাজিক। সেজন্যে ন্যূনতম শিক্ষার প্রকৃত বাস্তবায়নের জন্যে সামাজিক ব্যবস্থাপনা দরকার, কেবল প্রতিযোগিতামূলক বাজারি দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট নয়।

শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু শিক্ষার এই গুণগুলি একক ভাবে কার্যকরী হয় না। শিক্ষা কেবলই সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষা কখনই সর্বরোগ সংহারক মহৌষধ নয়। শিক্ষা বৃহত্তর সমাজের প্রেক্ষাপটে কেবলই সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা সম্পর্কে ইউনেসকো-র আর্ন্তজাতিক কমিশন পরিষ্কার করে বলেছে ঃ "The Commission does not see education as a miracle cure or magic formula opening the door to a world in which all ideals will be attained, but as one of principal means available to foster a deeper and more harmonious form of human development and thereby to reduce proverty, exclusion, ignorance, oppression and war." বস্তুত শিক্ষা, প্রথাগত কিংবা বিমুক্ত, মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যাবলী সমাধানের একমাত্র উপায় না হলেও গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষা, ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার রাজনীতি ঃ

শিক্ষার অন্যতম গুরুত্ব হল ব্যক্তির ক্ষমতায়ন। কিন্তু ক্ষমতায়ন কোনো শর্ত নিরপেক্ষ চরম বিষয় নয়। ক্ষমতায়ন সমাজের মধ্যেই হয়, মহাশূন্যে বা বনে-জঙ্গলে হয় না। তাই শিক্ষা থাকলেই ব্যক্তির ক্ষমতা থাকে না। সমাজ তথা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষা থাকলে ক্ষমতায়নের সুযোগ অনেক বেশি। আজকের প্রেক্ষাপটে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এ প্রসঙ্গে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। ইংরেজি ভাষায় যার দখল বেশি অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে তার ক্ষমতায়নের সুযোগও বেশি। বাদ পড়া মানুষদের শিক্ষার সময় তাদের ক্ষমতায়নের কথা বিবেচনায় নিয়ে আসলে তাদের ইংরেজি ভাষার ভিত শক্ত না করে বিকল্প রাস্তা নেই। এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে তাদের বাংলা দুর্বল হবে।

ক্ষমতায়নের সামাজিক দিকটিও বিবেচ্য। ক্ষমতা শূন্য থেকে আসে না। প্রচলিত সমাজে ক্ষমতা অর্জন মানে অন্যের ক্ষমতায় বা বিশেষ সুবিধায় ভাগ বসানো। এখানেই শিক্ষার রাজনীতি। ব্যক্তির ক্ষমতায়ন দানা বেঁধে সমষ্টির ক্ষমতায়নের দিকে এগিয়ে যায় এবং প্রয়োজনে সমষ্টিগত রাজনৈতিক ক্ষমতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীন ভারত, মধ্যযুগের ভারত, ব্রিটিশ ভারত কিংবা আজকের ভারতেও তাই শিক্ষা মুষ্টিমেয় মানুষের বিশেষ ভোগ্যবস্তু হিসেবেই থেকে গেছে। সকলের জন্যে শিক্ষায় 'সকলে' কতটা আন্তরিক এবং ঐকান্তিক তা একটি মৌলিক প্রশ্ন। ফ্রেইরে এ কারণেই শিক্ষাকে একটি রাজনৈতিক কাজ বলেই চিহ্নিত করেছেন।

ভারতের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম শিক্ষা নেই বলেই এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবহেলিতই থেকে গেছে। Jean Dreze এবং অমর্ত্য সেন - এর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে যথোপযুক্ত। তাঁরা বলেছেন যে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল দীর্ঘদিন যাবৎ সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষাকে নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ার পরও সরকারকে কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয় নি। কিন্তু শহুরে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে কিংবা সংগঠিত ধনী কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দামের ক্ষেত্রে কিংবা প্রতিরক্ষা বিভাগের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহের ক্ষেত্রে কিংবা বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণ গ্রহণের শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে এরকম উদাসীন এবং অসংলগ্ন ব্যবহার করলে নিশ্চিতভাবেই সরকারকে কঠিন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হত। আসলে বুনিয়াদি শিক্ষার মতো মৌলিক বিষয় নিয়ে সরকারের উদাসীন হয়েও টিকে থাকবার বিষয়টির সঙ্গে ব্যাপক নিরক্ষর মানুষের সংগঠিত রাজনৈতিক অক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

ফ্রেইরীয় তত্ত্ব প্রয়োগের প্রথম যুগ

মিহির ঘোষ দস্তিদার

সাক্ষরতায় প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি নিয়ে ফ্রেইরির চিন্তাভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। গতানুগতিক 'Eva viu a uva (ইভা আঙুর দেখল)' তাঁর পথ ছিল না। ছিল পথের প্রতিবন্ধক। প্রচলিত ধ্যান ধারণার ঊর্ধ্বে, তিনি ছিলেন এক মৌলিক শিক্ষাতত্ত্বের প্রবর্তক। এই তত্ত্ব প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়েও তিনি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিল অপরিসীম। যে Praxis বা পর্যানুশীলনের কথা তিনি বার বার বলে এসেছেন, সেই পর্যানুশীলনের ধারা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর নিজের কাজে।

তাঁর তত্ত্বের প্রয়োগ পদ্ধতিতে, প্রস্তুতি পর্বে কয়েকটি বিষয়ের ব্যবস্থাপনা তিনি বাধ্যতামূলক করেছিলেন। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে সাও পাওলোর ডায়াডিমা শহরে, এই ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে কার্যকর হয়েছিল।

এই ব্যবস্থাপনার মূল সূর ছিল এইরকম ঃ—

১) প্রশিক্ষকরা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন। এতে তাঁরা শিক্ষার্থীদের সমাজে বহুল ব্যবহৃত শব্দসম্ভারের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবেন।

২) দুটি পর্যায়ে সৃজনশীল শব্দ এবং ধাতুমূল বা শব্দমূলের তন্নিষ্ঠ অনুসন্ধান শুরু হবে। একটি পর্যায়ে থাকবে বহুমাত্রিক সংহতি। অপরটিতে থাকবে অনন্যসাধারণ মানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিযুক্তি।

৩) প্রথমেই এই সৃজনশীল শব্দগুলির কল্পচিত্রের সংকেতায়ন করা হবে। এই সংকেতায়িত কল্পচিত্রই উদ্দীপিত করবে নিপীড়নে হতবাক সেই সব মানুষকে, যাঁরা এতাবৎকাল নীরবতার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে আছেন। গণ্ডি ভেঙে তাঁরা বেরিয়ে আসবেন তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির সচেতন স্রষ্ঠা হয়ে।

৪) সৃজনশীল শব্দ এবং শব্দমূল বা ধাতুমূলের সংকেতায়িত রূপ যে বার্তা বহন করছে তার মর্মোদ্ধার করা হবে একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। এই পরিমণ্ডলটি যাঁর দায়িত্বে থাকবে তিনি কখনোই প্রচলিত অর্থে প্রশিক্ষক হবেন না। তিনি প্রেরণা যোগাবেন নিজের স্বার্থকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে। নিজের ব্যক্তিসত্তাকে তিনি তাঁর কাজের মধ্যে বিলীন করে দেবেন। তিনি যখন কোনো শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলবেন তখন কোনোমতেই যেন মনে না হয় যে একজন প্রশিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীর সঙ্গে

কথা বলছেন। যেন মনে হয় যে একজন প্রশিক্ষক-শিক্ষার্থী কথা বলছেন একজন শিক্ষার্থী-প্রশিক্ষকের সঙ্গে।

৫) থাকবে একটি সৃজনধর্মী নতুন সংকেতলিপি, যাতে রাখঢাক না রেখে খোলাখুলি সমালোচনা থাকবে, যার লক্ষ্য হবে সংগ্রাম, যা ঘোষণা করবে ঃ বিশ্বের এই রঙ্গ-ভূমিতে যাঁরা একদিন নিরক্ষর ছিলেন, তাঁরা আর রাজি নন সমাজে নিছক Vocal instrumentum বা সবাক যন্ত্র অর্থাৎ বস্তু হয়ে পড়ে থাকতে। বস্তু আজ ব্যক্তি হয়ে ওঠার পথে অগ্রগামী সৈনিক। বিষয় নয়, তাঁরাই হবেন তাঁদের নিজেদের ভাগ্যের বিষয়ী বা নিয়ন্তা। এই তাঁদের শপথ।

ফ্রেইরির চিন্তাধারার বিবর্তনে দুটি সুনির্দিষ্ট পর্যায় লক্ষ করা যায়। প্রথম পর্যায়কে আমরা ব্রাজিলীয় পর্যায় বলতে পারি। এই ব্রাজিলীয় পর্যায়ে. অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের আগে পর্যন্ত জ্ঞানতত্ত্বগত যে অভিমত তিনি পোষণ করতেন, সেই অভিমত আমরা বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হতে দেখেছি তাঁর বিশ্লেষণী স্তরোত্তরণের সমীক্ষায়।

তিনি মনে করতেন ঃ—

১) বিশ্লেষণী চেতনা উৎপন্ন হয়, শিক্ষামূলক বিশ্লেষণী ক্রিয়াকলাপ থেকে।

২) চেতনার বিকাশ নির্ভর করে, আলোচনা ও সমালোচনা এই দুটি শর্তের ওপর।

৩) বিশ্লেষণী চেতনা হল সেই সমাজের বৈশিষ্ট্য, যে সমাজে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো আছে।

মানুষের অনুসন্ধানী চেতনা, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম। এই ধারণার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে তাঁর মতামত। এই ধারণাই তাঁকে সাফল্য এনে দিয়েছে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ নির্বাসিত অবস্থায়, নীরবতার সংস্কৃতি বা পশ্চিমী গণতন্ত্রে তথাকথিত স্বাধীনতার সংজ্ঞার ওপর ফ্রেইরি আর ততখানি গুরুত্ব দেননি। এদের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব তিনি দিয়েছেন ধনতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত পুঁজিবাদী শোষণের ওপর; হেগেলের দর্শনের মূল সুরের সঙ্গে যার অনেকটাই সাযুজ্য দেখা যায়। তিনি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন প্রযুক্তি ও শিক্ষার রাজনৈতিক চরিত্রের ওপরেও।

১৯৬৪ সালের আগে, ব্রাজিলে তাঁর শিক্ষাপ্রসারের কর্মসূচিকে কী রাজনৈতিক মূল্য দিতে হবে বা এই কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাঁকে কতখানি অসুবিধের মধ্যে পড়তে হবে, ফ্রেইরি সেটা ভালোভাবেই জানতেন। তাঁর জ্ঞানতত্ত্বীয় অবস্থানে এগুলি ছিল গৌণ। কৌশল অবলম্বন করতে হবে একনায়কতন্ত্র এবং তার সহযোগী শ্রেণির বিরুদ্ধে। তবেই দূর হবে এই বাধা।

এই পরিস্থিতিতে ফ্রেইরি বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের মতাদর্শের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেন। তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নতুন এক দিগন্ত। তাঁর চলার পথে লাগল পরিবর্তনের ছোঁয়া। আদ্যন্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতির নতুন করে মূল্যায়ন করতে শুরু করলেন তিনি। ফলে আদর্শ ও জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর তাত্ত্বিক অভিমত পুরোপুরি বদলে গেল। রণকৌশল থেকে ফ্রেইরি দৃষ্টি ফেরালেন রণনীতির দিকে। মানুষকে সচেতন করার জন্যে যে লড়াই তিনি এতদিন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার অপর নাম হয়ে উঠল শ্রেণিসংগ্রাম। সাংস্কৃতিক সংহতি রূপান্তরিত হল রাজনৈতিক বিপ্লবে। এই দিক পরিবর্তন বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ফ্রেইরির বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণের ধারণায়।

'Education : The Practice of freedom'-এর ফ্রেইরি এবং 'Pedagogy of the Oppressed'-এর ফ্রেইরির মধ্যে রয়েছে অনেক অনেক পার্থক্য। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে প্রথমটি আজ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এতে তাঁর একটি উদার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। এতে পরিবর্তনের পথ হল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা এবং তার অন্তর্ভূক্ত হওয়া। দ্বিতীয়টিতে আছে তাঁর চরমপন্থী মতাদর্শ। এখানে পরিবর্তনের পথ হল ধ্বংস এবং বিপ্লব। Pedagogy of the Oppressed-এর তিনটি প্রধান বিষয় হল ঃ

১। চেতনায়ন
২। বিপ্লব
৩। বৈপ্লবিক মনোভাবকে জিইয়ে রাখার জন্যে, সংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদের এবং জনগণের মধ্যে আলোচনা ও সহযোগিতা।

ফ্রেইরির চিন্তাধারায় আর একটি পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। চেতনা বিকাশের ধারণা এবং তার তাৎপর্যও পালটে গেল। শিক্ষার যে ধারা তা আরো ধারালো, আরো বৈপ্লবিক হয়ে উঠল, আরও জোরদার হয়ে উঠল অত্যাচারিতের স্বার্থে, অত্যাচারিতের সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার। ওয়ালর্ড কাউন্সিল অফ চার্চেস-কে লেখা চিঠিতে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ—

আমার লড়াই পৃথিবীর হতভাগ্যদের হয়ে লড়াই। আমার পথ বিপ্লব।

****

ভাষাতত্ত্বের আলোকে "বর্ণপরিচয় — প্রথমভাগ"

সুনীলকুমার দত্ত

উইলিয়াম কুপার (William Cowper 1731-1800), যিনি পত্র সাহিত্যের জন্যও ইংরেজি সাহিত্যে সুখ্যাত, একটি সুন্দর চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ To fly a ballon is now in vogue in our country-side আমাদের কলকাতায় বিদ্যাসাগর মশাইকে নিয়ে মাতামাতি করাটা is in vogue now। অথচ দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল, comprador এবং ব্রিটিশের stooge। এ যাবৎ আমিও 'জনপথ'-এর পথিকই ছিলাম। এবং 'প্রথম ভাগ' নিয়ে বিশেষ কোনো ভাবনাচিন্তা কখনো করিনি।

সাম্প্রতিক কালে. এই নাচানাচি in vogue হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, ঘটনাচক্রে 'প্রথম ভাগ'-এর একটি copy আমার হাতে আসে। খুবই casually, আমি বইটির পৃষ্ঠাগুলি ওল্টাতে শুরু করি। মনে চলে যায় সুদূর অতীতে। After all, এই বই-এর মাধ্যমেই তো বই-এর জগতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়! বস্তুত, তখনকার দিনে সকলের ক্ষেত্রেই তাই হত। এই বইটিই তখন ছিল লেখাপড়ার দুনিয়ার প্রবেশ পথে একমাত্র gate pass। আজ পরিণত বয়সে, খুবই casually বইটির পৃষ্ঠা ওল্টাতে গিয়ে, হঠাৎ চমকে উঠি! বারবার বইটির আদ্যোপান্ত পড়তে থাকি। সত্যি কথা বলতে কী, এই primer টিকে তখনই আমি আবার নতুন করে আবিষ্কার করি। আবিষ্কার করি যে এটি রত্নখনি!

অবাক হয়ে ভাবি, আজ থেকে দেড়শো বছর আগে কী আশ্চর্য বিজ্ঞানসম্মতভাবেই না বইখানি বিদ্যাসাগর মশাই লিখেছিলেন। বইটির এই structure এবং cognitive approach যা modern linguistics-এর মূল কথা তা সে যুগে তিনি কোথায় পেলেন!

১৮৫৫ সালে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার ইতিহাসে বছরটি একটি landmark, যদিও সেরকম কেউ কিছু ভাবেন না। শিশুর জীবনে ভাষাশিক্ষা একটি অতি মূল্যবান স্তর। এবং সেটি যত বিজ্ঞানসম্মত হয় ততই মঙ্গল। বিদ্যাসাগর মশাই-এর আমলে এরকম কোনও ব্যবস্থাই ছিল না আমাদের দেশে। শুধু এরকম ব্যবস্থা কেন, সর্বজনীন শিক্ষার কোনও পরিকাঠামোই ছিল না। টোল-চতুষ্পাঠীতে যে শিক্ষা হত তা প্রাচীন অধীত বিদ্যার রোমন্থন এবং তাও ছিল সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির জন্যে। আমাদের গোলামই বানাক বা কেরানিই করুক Macaulay-র minutes-ই আমাদের শিক্ষার পথকে, ইংরেজি হলেও, গ্রামে-গঞ্জে প্রসারিত করেছিল। এবং সকলের জন্যে না হোক, বহুর জন্যে অন্তত শিক্ষার পরিকাঠামো তৈরি করেছিল। আজও কি আমরা সকলের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পেরেছি? মেকলের উল্লেখে পাঠক হয়তো বা ভুরু কোঁচকাতে পারেন। কিন্তু মেকলে ছাড়া আমাদের মধ্যযুগীয় অন্ধকার ধর্মীয় বৃত্ত

ও কাজির শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই ঘুরপাক খেতে হত। তর্কে আমি হারতে পারি, কিন্তু আমি কোনো hypothetical premise-এর মধ্যে যেতে রাজি নই।

এইপরিকাঠামোরই পরিদর্শক হয়ে বিদ্যাসাগর মশাই যে বিরাট শূন্যতার মুখোমুখি হলেন তা হল মাতৃভাষা শিক্ষা দেবার উপযুক্ত বইয়ের অভাব। এই অভাব পূরণের জন্যেই ব্যবহারিকতার দিকে লক্ষ রেখে ভাষা শিক্ষা দেবার মোটামুটি একটা পথ-নির্দেশ তিনি বাতলালেন আর তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ আমরা পেলাম *বর্ণপরিচয়-প্রথমভাগ।*

সে যুগে বইটি কোনও ঝড় তুলেছিল কি না আমরা জানি না। না ওঠাই স্বাভাবিক; কেননা বইটি ভাষা-শিক্ষা দেবার একটি সোপান ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু বইটি যে শিশু রবীন্দ্রনাথের মনে দাগ কেটেছিল তা তাঁর জীবনস্মৃতি আমাদের জানিয়ে দেয়। দেড়শো বছর ধরে বইটি বাংলার ঘরে ঘরে আদৃত হয়ে আসছে। আজ স্কুলের প্রাথমিক স্তর থেকে বইটি নির্বাসিত। অত্যাধুনিক মা-বাবারা বইটি সম্বন্ধে প্রায় অনবহিত। কিন্তু বইটি তবুও বাংলার চিত্তমানসে ভাস্বর। সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে কত তত্ত্ব এল, বইটি অবৈজ্ঞানিক বলে নিন্দিত হল। কোনও দ্বিতীয় শ্রেণির প্রকাশকও বইটির কোনও শোভন সংস্করণ করল না। কেবল তথাকথিত 'বটতলার' প্রকাশকরা বইটির মুদ্রণের পর মুদ্রণ করে চলেছে এবং সাধারণ ঘরের শিশুদের হাতে এখনও বইটি তুলে দিচ্ছে। Posh embellishment সচেতন, ফ্যাশন-দুরস্ত বাঙালির ঘরে বইটি taboo।

আজ শিশুদের হাতে অ আ ক খ শেখার নানা বই তাদের মা-বাবারা তুলে দেয়। মুদ্রণ-পারিপাট্যে এবং আধুনিক শিক্ষামতাদর্শের মোড়কে বইগুলি নয়নলোভন এবং গ্রহণযোগ্য। কিন্তু 'প্রথমভাগ' প্রথমভাগই!

যে-কালে Linguistics বা ভাষাতত্ত্ব অজ্ঞাত ছিল; বিশেষ করে দেশীয় ভাষা (native speech)-র খুঁটি-নাটি নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল না, কীভাবে তা শেখাতে হবে এই নিয়ে কেউ ভাবতই না, সে-কালে প্রথমভাগ-এর মতো একটি প্রায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে লেখা বই কী করে সম্ভব হল তা সত্যিই ভাববার বিষয়।

আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী ও অন্যতম চিন্তানায়ক Noam Chomsky (b.1928) - র Generative Grammar - এর মূল কথা হল ঃ ভাষার ধারণা অন্তর্জাত; প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই ভাষা স্বয়ংক্রিয়। ভাষাশিক্ষার এই দিকটি প্রথমভাগে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। যে শব্দ-রচনা, ছোটো ছোটো বাক্যবদ্ধ এবং মোটামুটি পরিচিত জগতের ছবি আমরা এখানে পাই তা চোমস্কীয় তত্ত্বেরই প্রকারান্তর প্রতিফলন। চার-পাঁচ বছরের একটি শিশু অনায়াসেই ভাবতে পারে কাল জল হয়েছিল বলে পথে কাদা হয়েছিল এবং দৌড়োতে গেলে সে পড়ে যাবে (১৩ পাঠ)। এইটুকু বোঝার জন্য তার অপরের সাহায্যের কোনও প্রয়োজন হবে না।

বলতে কী, ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব যথা Structuralism, অথবা Generative Grammar, অথবা Functional-Communicative Approach প্রভৃতি সবকিছুই তখন অপরিজ্ঞাত ছিল। Otto Jespersen (1860 - 1943), Edward Thorndike (1874 - 1949), Harvard Palmer (1877 - 1949), Leonard

Bloomfield (1887 - 1949), C Ogden (1889 - 1957) প্রভৃতি পণ্ডিতদের তখনো জন্মই হয়নি। Linguist- শ্রেষ্ঠ Noam Chomsky তো আমাদের সমসাময়িক। অথচ প্রথমভাগ পড়লে আমাদের এই ধারণাই হয় যে, বিদ্যাসাগর মশাই আপন অজান্তেই এই সব তত্ত্ব জানতেন। প্রথমভাগের গঠনশৈলী আমাদের এরকম একটি তত্ত্ব—structuralism-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। আভিধানিক সংজ্ঞা বলছে "Structural linguistics (is) the study of language as a system of inter-related elements." অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষাই আন্তর্সম্পর্কিত উপাদানে সংগঠিত। Meaning নয়, Synchronic description-এর ওপরেই এর ভিত, যা prescriptive না হয়ে descriptive। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে economically elegant as well as formal and explicit। আমরা বিশ্লেষণ করে একটু দেখাবার চেষ্টা করব প্রথমভাগ এই তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। যদিও বিদ্যাসাগর মশাই প্রচলিত অর্থে traditionalist.

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য নিয়ে বাংলা ভাষার জগতে তাঁর আগমন। শিক্ষণীয় বাংলা পুস্তকের অভাবই তাঁকে বাংলা text book রচনায় ব্রতী করেছিল। কিন্তু তাই বলে সংস্কৃত ভাষার ভার তিনি বাংলার ওপর চাপিয়ে দেননি। যে দুটি primer তিনি রচনা করেছিলেন তাদের grade দেখলেই তা বুঝতে পারা যাবে। কোথাও অর্থ-শিক্ষার উপর তিনি জোর দেননি এবং শিক্ষকদেরও সেরকম পরামর্শ দেননি। প্রথমভাগের ভূমিকাই তার নিদর্শন।

ভূমিকা দুটি পড়লে আমরা দেখতে পাব কীভাবে তিনি বাংলা ভাষার প্রকৃতি ধরেছিলেন। দীর্ঘ ঋ-কার ও দীর্ঘ ঌ-কারের ব্যবহার না থাকায় ঐ দুটি বর্ণ তিনি বর্ণমালা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। ঌ-কারকেও তিনি বাদ দিতে পারতেন, কিন্তু অতটা হয়তো এগোতে চাননি। সংস্কৃত বর্ণমালায় ড় ঢ় য় স্বতন্ত্র বর্ণ নয়; কিন্তু বাংলায় যেহেতু এদের নিজস্ব উচ্চারণ আছে সেহেতু এদের তিনি বর্ণমালায় ঠাঁই দিয়েছিলেন। খণ্ড ত (ৎ) সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন নি; কেন না, 'ত'-এর দুটি রূপই তাঁর সময়েও বর্তমান ছিল। 'ষষ্টিতম সংস্করণ'-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় ত কারের ত, ৎ, এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে; দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড ত কার।" ত-এ হসন্ত চিহ্ন দৃষ্টি কটু বা অসুবিধাজনক বিধায় তিনি হয়তো এই দুটি কলেবরই রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। বাংলা উচ্চারণের প্রকৃতিকেও তিনি ঠিক ধরেছিলেন এবং সেইভাবে স্বরান্ত ও হসন্ত উচ্চারণের পরামর্শও দিয়েছিলেন। অজ্ঞতাবশত আমরা ছাঁচে ঢেলে পড়ে স্বস্তি পাই।

আজকাল একটা অদ্ভুত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে — উচ্চারণমাফিক বানান লেখা। এবং তার ফলশ্রুতি মাৎস্যন্যায়। কিন্তু ঠিক কথাটি কে বলবে তা তো আমরা জানি না। আমরা সবাই রাজা। বাংলাও কিছুটা ইংরেজির মতো unphonetic এবং উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করা বেশ দুঃসাধ্য। এ কথাটি অনেকে বুঝতে চান না (Bengali Phonetics- A New Approach-Firma KLM দ্রষ্টব্য)। ফলে একই শব্দ, নানান বানান। মরবি তো মর শিক্ষার্থী পড়ুয়ারা। বিদ্যাসাগর মশাই তাই অযথা ই-ঈ-কার, বা ও-কার

বা কিম্ভুতকিমাকর / ্যা / - কার যোগে (যেমন "অ্যাক/এ্যাক"), অথবা হসন্ত চিহ্নে ভাষাকে কণ্টকিত করতে চাননি।

Leonard Bloomfield-এর মতে সব ভাষারই একটা নিজস্ব গঠন থাকে। বাংলা ভাষার গঠনটি ধরতে পেরেছিলেন বলে বাংলা গদ্যের একটি সুষ্ঠু কাঠামো বিদ্যাসাগর মশাই তৈরি করতে পেরেছিলেন। বাংলা গদ্যের structure যে মূলত N + V (Noun + Verb) বা N + N + V (Noun + Noun + Verb), বা N + Adj / Comp (Noun + Adjective / Complement), এটি তিনি অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বর্ণযোজনা আর বাক্য গঠনে তিনি অসামান্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। দুচারটি ছাড়া অপরিচিত শব্দ তিনি ব্যবহারই করেননি এবং শিশুর পরিচিত জগতের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছেন।

প্রথমে বর্ণের সংযোগে শব্দ গঠন এবং তারপর দুটি শব্দের এবং ক্রমান্বয়ে তিনটি, চারটি শব্দের বাক্যরচনা—কোনওটিই প্রথম-পাঠ-নেওয়া শিশুর অনধিগম্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'জল পড়ে, মেঘ ডাকে' অথবা 'কাক ডাকিতেছে', 'পাখী উড়িতেছে' অথবা 'আমি মুখ ধুইয়াছি', 'ভুবন কাপড় পরিয়াছে', অথবা 'কখনও মিছা কথা কহিও না', 'কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না' প্রভৃতি বাক্য, সাধুভাষায় রচিত হলেও, শুধু শিশুর পরিচিতই নয়, অধিগম্যও বটে। আর বাক্যগুলির concept স্বাভাবিকভাবেই শিশুর অন্তর্জাত—Chomsky প্রমুখ আধুনিক linguist-রা যা বলেন। উদ্ধৃত বাক্যগুলি কি আমাদের এটাই বুঝিয়ে দেয় না যে প্রচলিত ভাষাভঙ্গির সঙ্গেই বাক্যগুলির সম্পর্ক এবং তাদের প্রকৃতি descriptive? তাদের structure-এর ভিত্তি emperical experience-এর ওপর এবং তারা economically elegant. কোনও বাহুল্য নেই, কৃত্রিমতা বা অযথা কোনও embellishment নেই।

প্রথমভাগের ১৯ ও ২০ পাঠকে structuralism-এর চূড়ান্ত নিদর্শন হিসাবে আমরা তুলে ধরতে পারি। ঐ দুটি পাঠ শুধু বাংলা ভাষায় কেন, বাংলা সাহিত্যেও স্মরণীয়। Classic মর্যাদায় মহিমান্বিত। গোপাল বা রাখালকে যে বাঙালি চেনে না তার বাঙালিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ এই দুটি চরিত্রের একাধিক উল্লেখ করেছেন। বাক্য-গঠনে, শব্দ বিন্যাসে, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার প্রয়োগে, যুক্তাক্ষর-বর্জিত শব্দ চয়নে এমন সহজাত অকৃত্রিমতায় পাঠদুটি explicitly formal অথচ synchronously descriptive.

বিশেষভাবে বলতে গেলে, বর্ণ ও অক্ষর যোজনায় এবং সমজাতীয় বিষয় নিয়ে পাঠ (lesson)-রচনায় এবং অনুচ্ছেদ গঠনে প্রথম ভাগ ভাষা শিক্ষার পথিকৃৎ। অবশ্য, কিছু কিছু শব্দ হয়তো চার-পাঁচ বছরের শিশুর অভিজ্ঞতার বাইরে। কিন্তু একটা ব্যাপার দেখা যায়, সরল একটি যোগ বা গুণ করতে বিফল হলেও পারিস্থিতিক ভাষা প্রয়োগে একটি শিশু অসামান্য দক্ষতা দেখায়। এটি সম্ভব "because the rules he uses are inbuilt, and so he knows most of the rules by virtue of being a human being." — Noam Chomsky অনুসরণে। এটিও আধুনিক linguistics-এর

inbuilt universal grammar।

বিদ্যাসাগর মশাই নিশ্চয় এত ভাবেননি। কিন্তু আপন অজান্তেই তিনি আধুনিক linguistics-এর পরিচয় রেখে গেছেন। অতি অধুনার বঙ্গদেশে 'শিক্ষাবিদরা' ভাষা বা শিক্ষণীয় বিষয়ের অতিসহজীকরণে মেতে উঠেছেন। ফলে শিশুদের না হচ্ছে মানসিক বিকাশ না শিক্ষার সঙ্গে সহবাস। মন-গড়া পাণ্ডিত্য নিয়ে পণ্ডিতদের মুখেন মারিতং জগত আর অন্যথায় bank balance-এর সহবৎ।

কিন্তু এ যাবৎ আমরা যা আলোচনা করলাম তাতে প্রথমভাগের পরিকল্পনাটি আমরা বাদ দিয়ে যাচ্ছি। সত্যি বলতে কি, এই পরিকল্পনাটি ভাষা-বিজ্ঞানের নিরিখে খুবই বৈজ্ঞানিক্। প্রথমে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ এবং তাদের পরীক্ষা; তারপর ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে স্বর বর্ণ যোগে শব্দ গঠন; পরের স্তরে অক্ষর সন্নিবেশে মিশ্র উদাহরণ; ং ঃ ঁ-যোগে শব্দ গঠন ইত্যাদি এবং তার শেষ পর্ব পাঠ বা lesson — এক থেকে কুড়ি। এক থেকে আট পাঠ দুটি শব্দের যোগে phrase বা sentence; নয় থেকে বারো পাঠ simple descriptive বাক্যের সন্নিবেশ; তেরো থেকে আঠেরো পাঠ মিশ্র বাক্য গঠনের নিদর্শন এবং উনিশ ও কুড়ি পাঠ যথারীতি যৌগিক ও মিশ্র বাক্যবন্ধের সমাহার। 'Language rules' যদি 'inbuilt' না হয় এবং 'language itself' যদি 'structurally cognitive' না হয় তাহলে শিশুদের পক্ষে ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এসব তত্ত্ব বিদ্যাসাগর মশায়ের জানার কথা নয়। কিন্তু প্রথমভাগ একটু অভিনিবেশ সহকারে পড়লে এই ভাষা-বিজ্ঞানসম্মত দিকগুলি পাঠকের মনে জেগে উঠবে। এটা ঠিকই structural বা cognitive theory তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় এবং জানলেও এত তলিয়ে দেখা অসম্ভব, আর তার দরকারও নেই। কিন্তু প্রথমভাগ যে আশ্চর্য রকমভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লেখা সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর সময়ে যদি ভাষাতত্ত্বের সামান্যতম বিকাশও হত অথবা তিনি নিজেই এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতেন হয়তো তিনি প্রথম ভাগ-কে আরো বিজ্ঞানসম্মত করতে পারতেন। কিন্তু আমরা যা পেয়েছি তাই বা কম কী!

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ-এর কথা আমাদের মনে আসে, যদিও সেটা আমাদের আলোচনার বাইরে। শিশুদের ভাষা-শিক্ষা দেবার জন্য বর্ণপরিচয়ের পরেই সহজপাঠ। ভাষা-শিক্ষা দেবার এমন graded primer অন্য কোনও ভারতীয় ভাষায় আছে কি না তা আমরা জানি না। ভাবতেও অবাক লাগে বিপুল সাহিত্য সম্ভার সৃষ্টি করেও শিশুদের ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যে একটি মনোরম বই তিনি লিখে ফেললেন। পৃথিবীর শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা। আমাদের পরম সৌভাগ্য এরকম এক অলোকসামান্য প্রতিভাকে আমরা পেয়েছিলাম। আমরা কি তার যোগ্য হতে পেরেছি? তিনি উজাড় করে দিয়ে গেছেন; আমরা অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করেছি মাত্র। কী মহীয়ান ছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগর মশাই-এর পথিকৃতের ভূমিকা স্বীকার করে সহজপাঠ পড়ানোর তিনি নির্দেশ রেখে গেছেন ঃ "নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক চিত্রভূষিত এই বই বর্ণপরিচয়ের পর পঠনীয়"। প্রথমভাগের রসে তিনি নিজেই তো নিমজ্জিত হয়েছিলেন।

বাস্তবিক প্রথমভাগের naive simplicity এবং genuine originality আমাদের

বিস্ময়ে মুগ্ধ করে। আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের ক্যামেরায় বইটির যে ছবিটি ফুটে ওঠে তা perfectly all right with some keen observations, যা শিশুর ভাষাজ্ঞান সহজেই অতিক্রম করে। আমরা দেখলাম কেবল structurally-ই নয়, cognitivity-তেও বইটি আধারিত। যদি আমরা socio-linguistics competence-এর কথা ভাবি তাহলেও বইটি aptly suitable। বইটির বাক্যগুলি কি social context-এ বিধৃত নয়? যে কোনও একটি পাঠ নিয়েই আমরা এই প্রশ্নের মোকাবিলা করতে পারি। Socio-linguistics-এর অন্যতম প্রবক্তা Hymes-কে একটু উদ্ধৃত করা যাক ঃ "We have then to account for the fact that a normal child acquires knowledge of sentences, not only as grammatical, but also as appropriate." এরকম কথা কি একটি ৩+ বা ৪+ শিশু বলতে বা ভাবতে পারে না? — "দেখ রাম, কাল তুমি পড়িবার সময় বড় গোল করিয়াছিলে। পড়িবার সময় গোল করিলে ভাল পড়া হয় না; কেহ শুনিতে পায় না। তোমাকে বারণ করিতেছি আর কখনও পড়িবার সময় গোল করিও না।" মুখের ভাষাটিই বিদ্যাসাগর মশাই তৎকাল প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী (একটি standard form) বই-এর ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। বর্ণপরিচয়-প্রথমভাগ বাংলা ভাষায় সত্যিই প্রথম এবং অদ্বিতীয়।

****

"আমার মতে ব্যাপক নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্য পরিষেবার নিদারুণ অভাব, অসম্পূর্ণ ভূমিসংস্কার, নারী-পুরুষে বৈষম্য, নারী সমাজকে বঞ্চিত রাখা এবং শিশুদের অবহেলাই হল দারিদ্র্যের সংজ্ঞা।"

— অমর্ত্য সেন

২১.১০.৯৮ -*Voice of America* *গণশক্তি/২৩.১০.৯৮*

পরিবেশ দূষণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পৌরসভা

প্রভাত কুমার সরকার

জল-বায়ু-মাটি পাথর দিয়ে এই বিশ্ব প্রকৃতি গঠিত হয়েছে, তাতে প্রাণের আবির্ভাবে জীব জগতের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভিদ জন্তু জানোয়ারের পরে মানুষের আবির্ভাব। প্রকৃতির বুকে প্রাণের আবির্ভাবের পর হতে প্রাকৃতিক সম্পদে লালিত-পালিত জীবনধারার ভারসাম্য রক্ষা করে পৃথিবী আবর্তিত হয়ে চলেছে। এই প্রাণী সম্পদের শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষ। আজ থেকে ১৫-২০ হাজার বৎসর পূর্বে হোমো সেপিয়ান সেপিয়ান গোষ্ঠীর মানুষও জীব জগতের জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে সমান অধিকারে প্রকৃতির সম্পদ ভোগ করত। তারা প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত, আবার ভয়ও করত।

মানুষের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এল কৃষি ও পশুপালন এবং সভ্যতার আরও অগ্রগতিতে শুরু হল নগর সভ্যতা। বুদ্ধিমান-জীব মানুষ, বিজ্ঞানের আবিষ্কারে ও তার বিবর্তনে মানব জীবনে এল ভোগ বিলাস। তাই বুদ্ধিকে পাথেয় করে শোষণ শাসনের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক মানুষ বহু সংখ্যক মানুষকে দাসে পরিণত করল। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার অহংকারে এই কিছু সংখ্যক দর্পিত মানুষ কেবল মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার নয়, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরও তাদের শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। তারা ভুলে যাচ্ছে যে এই অবাধ আলো-হাওয়া, প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার বিশ্বের সকল প্রাণীর এবং তা সমবন্টনেই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা পাবে। প্রকৃতিকে ক্ষত-বিক্ষত করে কলকারখানার দূষিত ধোঁয়া চিমনি দিয়ে বের হয়ে আকাশ বাতাসের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলা, কারখানা ও নগরের বর্জ্য পদার্থ নদীনালাতে ফেলে নদীর সুনির্মল জল দূষিত করা বা কীট-পতঙ্গ নাশক বিষাক্ত ওষুধ ব্যবহার করে প্রকৃতির মৃত্তিকাকে বিষাক্ত করে তুলে বসুন্ধরার মৃত্যু ডেকে এনে মানুষ নিজেকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বিশ্বের কিছু ধনী লোকের লালসা ও লোভে বিশ্বপ্রকৃত আতঙ্কিত। এই লোভ লালসার পরিণতিতে মনুষ্য জাতির ধ্বংস অবধারিত।

ধনতান্ত্রিক বিকাশ

ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ইন্ডাস্ট্রির প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল কলকারখানার চিমনি দিয়ে যে ধোঁয়া বের হচ্ছে তা অক্সাইড গ্যাস। আকাশের বায়ুতে মিশে সালফিউরিক নাইট্রিক অ্যাসিড হয়ে বসুন্ধরার বুকে বৃষ্টির ধারার (acid rain) সঙ্গে ঝরে পড়ে। এই বিষাক্ত অ্যাসিড মানুষসহ সমগ্র প্রাণীজগৎকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এই বিষয়টি আবিষ্কৃত হবার পর আজ বিশ্বের ধনী দেশগুলি আতঙ্কিত। আবার CO_2, CH_4, CFC_5, N_2O, SO_2, O_3 র মাত্রা বায়ুর মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুর উত্তাপ

বৃদ্ধি পাচ্ছে। একেই Green House Gas বলে। এইভাবে চললে ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধির হার ১°C থেকে ৩.৫°C হবে। আর তার ফলে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর জমা বরফ গলে সমুদ্রের জলের উচ্চতা ০.৩ মিটার থেকে ১.১ মিটার বৃদ্ধি পাবে। এর পরিণতিতে বিশ্বের নীচু দেশ বা স্থান সকল জলের তলায় চলে যাবে।

১৯৯৩ সালে বিশ্বের পরিবেশবিদ্‌রা মেক্সিকোর মেরিডা শহরে Human Ecology সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। সেই সম্মেলনে বর্তমান প্রবন্ধকারের প্রশ্নের জবাবে বিশ্বের জনসংখ্যা বিষয়ে অধ্যাপক N. Wolanski বলেছিলেন, "whether modern man is a part of ecosystems or whether his culture has gone beyond them". যদিও সকলে নীতিগত ভাবে মেনে নিয়েছেন যে man is an integral part of ecosystem কিন্তু ধনতন্ত্রবাদী জগৎ তাকে উপেক্ষা করে মুনাফা লুটে চলেছে।

ধারাবাহিক বিকাশে দরিদ্রতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের ধনতন্ত্র ভোগ বিলাসের বস্তু বা সামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধি করে যে সংস্কৃতির সূচনা করেছে, তারজন্যে নানারকম ছোটো বড়ো কলকারখানা দেশের নানাদিকে গজিয়ে উঠছে। ফলে বিশ্ব পরিবেশের জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে জ্ঞানী বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহল্‌ম শহরে মিলিত হয়ে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে আরম্ভ করলেন। ১৯৮৭ সালে সুইডেনের কলেজের ছাত্ররা প্রবন্ধকারকে বলেছিলেন যে ব্যবসায়ীদের টাকার লোভ এত বেড়ে যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষকে তারা বাঁচতে দেবে না।

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রায়ো ডি জেনিরো শহরে বসুন্ধরা সম্মেলন হয়। সেখানে বিশ্বনেতারা sustainable development (স্থায়ী বিকাশ) নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়েছিলেন। আলোচনাতে বসে তাঁরা কতগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন, যাকে বাস্তব পদক্ষেপ বলা যায়। এই পদক্ষেপের Agenda-21-এ Poverty এবং biodiversity নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এই আলোচনার পর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সমীক্ষা আরম্ভ হল এবং তা নিয়ে যে সব কর্মশালা হয় সেখানে জৈব জগতের ভারসাম্য রক্ষা করতে বিশ্ব হতে দারিদ্র্য দূরীকরণ নীতি প্রাধান্য পায়। ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেস্‌বার্গে (Johannesburg) যে World Summit হয়, সে সম্বন্ধে বলা হল Crucial role of sustainable use in maintaining the variability and variety of life, the biodiversity that "feeds and clothes us and provides housing, medicines and spiritual nourishment". Ten years later, the Plan of Implementation of the World Summit of Sustainable Development, reiterated, how sustainable use is an effective tool to combat poverty and to achieve sustainable development. অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে আধুনিক বিশ্বের ধনকুবের মানুষ নিজেদের অর্থে বিশ্বের সর্বহারাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে তুলতে চান যাতে দারিদ্র্য সীমার নীচে কেউ না থাকে।

তাদের প্রত্যেকের ঘরে নিত্য ব্যবহার্য-সামগ্রীর মত টি.ভি., ফোন ইত্যাদি আবশ্যকীয় বস্তু থাকলে তাদের সর্বহারা বলা যাবে না।

এ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। এর সফল রূপায়ণে বিশ্বের সচেতন মানুষদের একত্র হয়ে সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি ধারাকে উপলব্ধি করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমে দেখা যাক বিশ্বে ধনী ও দরিদ্র সংখ্যার সমীক্ষার বিবরণ। ২০০৪ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৬২৮ কোটি। সেখানে ধনীর সংখ্যা মাত্র ৭০ হাজার, যাদের স্থাবর সম্পত্তি ৩ কোটি মার্কিন ডলার বা তার বেশি (১৪৪ কোটি টাকা) এবং সাধারণ ধনীর সংখ্যা ৭৭ লক্ষ, যাদের স্থাবর সম্পত্তি ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার (৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা) বা তার বেশি। এদের বলা হয় H N W (High Net Worth) Individual।

বিশ্বের ধনী দেশগুলিতে আধুনিক বিলাস বহুল জীবন যাত্রার মান বজায় রাখতে বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে। এই ধরনের জীবনধারা ভোগ করছে এক ইউরোপেই বিশ্বের শতকরা ১১ জন এবং উত্তর আমেরিকাতে শতকরা ৫ জন। এছাড়া দরিদ্র দেশে বসবাসকারী কিছু বিলাসী ধনী আছেন যাঁরা প্রাকৃতিক পরিবেশ উপেক্ষা করে যান্ত্রিক জীবনের আরামে অভ্যস্ত।

চিরস্থায়ী বিকাশ (Sustainable development) এর পরিকল্পনাতে বিশ্বের দরিদ্র জনসংখ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম — অতি দরিদ্র, যাদের দৈনিক আয় ১ ডলার বা ১ ডলারের বেশি। এদের সংখ্যা ২৮০ কোটি জন। একদিকে এদের জীবন যাত্রার মান উন্নত না করলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে এই বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের ক্রেতারূপে না পাওয়া গেলে দরিদ্র দেশগুলিতে বিশ্বায়নের শোষণ সফল করা সম্ভব নয়। তার জন্যে ২০১৫ সাল হতে ২০২০ সালের মধ্যে যেমন এদের দারিদ্র্য দূর করতে হবে, তেমনই এদের নিরক্ষরতাও দূর করতে হবে।

এখানে পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষা তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। দরিদ্রদের মধ্যে আছে নীরবতার সংস্কৃতি বা Culture of Silence. প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের জীবন আচরণকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি রুচি এবং জীবন যাত্রায় আকৃষ্ট রাখে। এথেকে তাদের মুক্ত করে সম্পূর্ণ সচেতন মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠা করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার প্রাণ পুরুষ সত্যেন মৈত্র বলেছেন, শিক্ষাকে প্রথাগত যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করে সমষ্টিগতভাবে উন্নয়নের প্রকৃষ্ট পথের লক্ষ্যই শিক্ষার (তথা সাক্ষরতার) লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুস্থ, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থেকে, স্বনির্ভর উন্নয়ন মূলক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট না করে, প্রযুক্তির প্রসার ও বিকাশের লক্ষ্যই হোক বিধিবদ্ধ শিক্ষা। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আলাদা বিবেচনা করা উচিত হবে না।

আমাদের সাক্ষরতার কর্মীদের উপলব্ধি করতে হবে যে যাদের মধ্যে তাঁরা কাজ করছেন বা করতে যাচ্ছেন সেই সব পরিবারের দারিদ্র্য দূর করে সচেতন করার অর্থ কেবল বিশ্বায়নের দৃষ্টিতে আর্থিক মানদণ্ডে বিচার করলে ঠিক হবে না। তার সঙ্গে

পাশ্চাত্য স ংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ না করে স্বনির্ভর হতে হবে। তাই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধেয় সত্যেন মৈত্র ও ফ্রেইরির আদর্শকে যুক্ত করে গ্রহণ করতে হবে।

পৌরসভার সাম্প্রতিক প্রকল্প

এইবার এখানে পশ্চিমবঙ্গের (ভারতের) নগর সভ্যতায় দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি সম্বন্ধে আলোচনায় আসছি। এখানকার নগরে আজ এক একটি পাড়া বা অঞ্চলে আকাশ চুম্বি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, লিফট্‌যুক্ত প্রাসাদ, প্রমোদ ভবন, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, বিগ বাজার বা মল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অন্যদিকে এই নগরেই অস্বাস্থ্যকর জলা, নীচু পরিবেশে যে সব বস্তি রয়ে গেছে, সেখানে বাঁচবার তাগিদে গ্রামের সর্বহারা মানুষগুলি আস্তানা গড়ে আছে এবং ধনীদের বাড়ি বাড়ি কাজের লোকের অভাব পূরণ করে চলেছে।

বর্তমান ভারতে শতকরা ২৭ জন শহরবাসী। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের শহরে শতকরা ২৮ জন বাস করে। আর শতকরা ৩৫ জন বস্তিবাসী। আবার তাদের মধ্যে ১৬ জন দারিদ্র্যসীমার নীচে।

ভারতে অতি বিত্তবান ২০০২ সালে ৫০,০৩০ ছিল। ২০০৩ সালে হয়েছে ৬১,০০০ জন। অর্থাৎ ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও বিশ্বে এই হার ৭.৫ শতাংশ। আবার ধনীদের মধ্যে যারা ওপরের দিকে, তাদের ২০ শতাংশ দেশের আয়ের ৪৬.১ শতাংশ নিজেদের ঘরে তোলে। আর সেখানে ২৩ শতাংশ দরিদ্র আয় করে ৮.১ শতাংশ।

বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ নীতির মূল কথা হচ্ছে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করা এবং অনুদান হ্রাস করে দরিদ্র জনগণের প্রতি সরকারের দায়িত্বও বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া। এর ফলে আজ ৫৮ বৎসর ভারত স্বাধীন হলেও নগর উন্নয়নের সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বেশ কিছু আন্দোলনের পরে ছোটো শহরগুলির পৌর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন করার জন্য ১৯৯৫-৯৬ সালে "প্রধান মন্ত্রীর সুসংহত শহর-অঞ্চল দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প" (PMI - UPEP) গৃহীত হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য বস্তিবাসীদের পরিকাঠামো ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। প্রথম স্তরে—এর পরিচালনার জন্য জীবন ধারণের পরিবেশ পরিকাঠামো (Non economic parameter) এর সমীক্ষা করে বস্তির ১০-৪০ পরিবার বাছাই করা হয়, যাদের আয় বাৎসরিক ১১,৪৫০.০০ টাকা বা তার কম। সেই সব পরিবার হতে মহিলাদের সদস্য করে যে সমিতি গঠিত হয়, তাকে বলা হয় নেবারহুড মহিলা কমিটি বা NHG অথবা পাড়া মহিলা গোষ্ঠী। এর পরিচালনা করবার ভার দেওয়া হয়ে থাকে এই সকল পরিবারের কর্মঠ স্বেচ্ছাসেবী সহায়িকা বা RCV-র উপর। এই পাড়া মহিলা গোষ্ঠী; তৃণমূলীস্তরের মূল বিকাশের কাজ সম্পন্ন করবে।

দ্বিতীয় স্তরে — প্রতি ওয়ার্ড হতে NHGএর RCVদের নিয়ে যে সাংগঠনিক কমিটি তৈরি হয় তাকেই পাড়া কমিটি গোষ্ঠী বলা হয়। এখানে ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক ও কিছু সমাজ সেবী থাকবেন। কিন্তু মূল ভোটের অধিকার থাকে

RCV-র হাতে। এই কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে বিকাশের রূপরেখা স্থির করা হয়।

তৃতীয় স্তরে — প্রতিটি পৌরসভায় ৬-৭টি ওয়ার্ডের NHC কমিটি, সভাপতি ও সম্পাদক নিয়ে যে কমিটি গঠন করা হয় তাকে CDS বা সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি বলা হয়। এটি সম্পূর্ণ মহিলা কমিটি এবং পূর্ণ সময়ের জন্য CO অর্থাৎ Community Organiser যুক্ত থেকে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করেন।

পৌরসভাতে পৌর প্রতিনিধির নেতৃত্বে কাউন্সিলার ইন চার্জ এবং PO (পরিকল্পনা পদাধিকারী) কে নিয়ে UPE Cell গঠন করা হয়, তাতে প্রত্যেক CO ও CDS ও সভাপতি থাকেন এবং স্বর্ণ জয়ন্তী শহরে রোজগার যোজনা বা SJSRY-র কর্ম সাফল্যের সকল দায়িত্বই এই Cell-এর উপর ন্যস্ত।

এছাড়া ১৯৯৭ এর December এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের SUDA (State Urban Development Agency), NRY (নেহেরু রোজগার যোজনা) এবং UBSP শহরের গরিবদের ন্যূনতম পরিষেবা প্রকল্প এর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার ফলে এই প্রকল্পটি আরও বিরাট আকারে বিস্তার লাভ করে নাম হয় SJSRY। বর্তমান একে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

সাংগঠনিক পরিকাঠামো, নির্মাণ ও প্রশিক্ষণে SUDA প্রতিটি পৌরসভার CDS এর জন্য অভিন্ন সংবিধান প্রস্তুত করে। সোসাইটির রেজিস্ট্রেশন বিধি অনুসারে নথিভুক্ত করা হয়। এর ফলে প্রতি বৎসর বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষা, সাধারণ সভার রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে NHG-র সংখ্যা ৩৫৩৭৪টি, NHC-র সংখ্যা ৩২৯৫টি এবং CDS এর সংখ্যা ৩০২টি।

SJSRY — রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সবচেয়ে বড় পৌরসভা হল রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা। এখানকার কর্মযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরলে বোঝা যাবে কীভাবে এখানকার দরিদ্র পাড়ার মেয়েরা যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে sustaintable development -এর পথে এগিয়ে চলেছে। এই সকল মহিলাদের আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে দৃঢ় পদক্ষেপে লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে চলার অনমনীয় ক্ষমতা দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে এই সংগঠনের (NHG)র তৃণমূল স্তর থেকে লেখক যুক্ত ছিলেন। তাই আজকের দিনে এই পরিবর্তন দেখে তিনি মুগ্ধ। এবং যে কেউ এই পরিবর্তন লক্ষ্য করলে তা অনুধাবন করতে পারবেন।

প্রারম্ভিক স্তরে যখন লেখক RCVদের চয়ন করেছিলেন বা বলা যেতে পারে বেছে নিয়েছিলেন, তখন তাদের অনেকে নিজেদের অভাব অভিযোগ ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারত না। তারপর তাদের বিভিন্ন কর্মশালায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। এখন তারা সুন্দর ভাবে কেবল তাদের নিজেদের কথা নয়, সকলের বক্তব্য তাদের পদাধিকারীদের সামনে প্রকাশ করে। এমন কি প্রয়োজনে মন্ত্রীদের কাছেও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। আবার বিভিন্ন সভাতে এরা সভাপতিত্ব করে সভা পরিচালনা করেছে বা করছে। কোনো জড়তা নেই,

নেই কোনো অস্পষ্টতা, এমনই সাবলীল-আত্মবিশ্বাসী।

এবার আসা যাক চারভাগে বিভক্ত পরিষেবার কথায়। (১) প্রথম ধাপে তারা পাড়াগুলির প্রয়োজনের তালিকা প্রস্তুত করে এর গুরুত্ব অনুসারে পাড়ার রাস্তা, নালা, পায়খানা, টিউবওয়েল, এমন কি অতি প্রয়োজনে ১৬,০০০.০০ টাকায় ঘর নির্মাণ-কার্য পরিচালনা করে।

কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পরিবারের ছেলে মেয়েদের যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশার প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে CO এবং PO-র ভূমিকা লক্ষণীয়। বর্তমানে ১৬টি বিষয়ে ৭৮৩ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তাতে ২১.৪৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এইসব বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছেলে মেয়েরা কেউ কেউ কাজ পেলেও বেশির ভাগই মেরামতির ব্যবসা আরম্ভ করেছে। ব্যাংকের অনীহা থাকলেও অল্প অল্প মূলধন এই প্রকল্পে ব্যবস্থা হচ্ছে। ১৮২টি ঋণের আবেদনের মধ্যে মোট ১১টি আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। এতে শতকরা ১৫ ভাগ অনুদান হিসাবে দেওয়া হবে।

(২) ক্ষুদ্র সঞ্চয় ঋণদান গোষ্ঠী

CDS-এর মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের আরও বহু কাজ করা হচ্ছে। যেমন, বার্ধক্য ভাতা বিতরণ, GR বিতরণ, মাতৃত্বকালীন সাহায্য, বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা কার্যকরী করা ইত্যাদি। সাধারণত এই সব পরিবারে দুই প্রকারের ঋণের প্রয়োজন হয়।

(ক) হঠাৎ পরিবারের জন্য স্বল্প ঋণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

(খ) ব্যবসার জন্য বড়ো ঋণ।

ব্যাংক ছাড়া বড়ো ঋণ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ছোটোখাটো ঋণ নিয়ে যন্ত্র কিনে বা মেরামত করে পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব। এই কাজ এই প্রকল্পের মাধ্যমে সম্ভব। NHG স্তরে ১০ থেকে ২০ জন মহিলা নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করে CDS-এর মাধ্যমে ও তার নিয়ম অনুসারে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট (account) খুলে প্রতি মাসে ২০.০০ টাকা জমা করা হয়। এই জমা টাকা ও তার সুদ থেকে স্বল্প ঋণ পাওয়া যায়। আবার সঠিক পদ্ধতিতে চলার পর সরকার থেকে সদস্য পিছু ১০০০.০০ টাকা করে আবর্তক মূলধন বা Revolving Fund হিসাবে পুর সভার UPE Cell এর তত্ত্বাবধানে CDS এ জমা পড়ে। এখান থেকে প্রতি মাসে কেবল ব্যবসার জন্য ঋণ পাওয়া যায়।

২০০৫ সালের সূচনাতে এখানে ২১২টি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এবং এতে ৩৯৫২ জন সদস্য মোট ২১.৯০ লক্ষ টাকা জমা করেছে এবং এর ২৭.৮২ লক্ষ টাকা অনুদান এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা হল ১০২৫৪টি, যার সদস্য সংখ্যা ১.৬৪ লক্ষ এবং ২৩৬টি ডাকুয়া (**Dwcua**) গোষ্ঠী। এতে ৫ কোটি সদস্যদের জমানো অর্থ এবং সরকারি অনুদান নিয়ে ১১.০৭ কোটি টাকা জমা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬০ কোটি টাকা দাবি রেখেছে। যদিও রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা এই বিশাল কর্মকাণ্ড সুপরিচালিত করতে কম্পিউটারের সাহায্য গ্রহণ করেছে, তবুও এর সঙ্গে CO ও PO-র সাথে RCV-দের

অক্লান্ত পরিশ্রম যুক্ত আছে। আর নিয়মিত সময়ে অডিট হচ্ছে।

(৩) K.U.S.P (কাসপ) কলকাতা আরবান সার্ভিসেস ফর দি পুওর (Kolkata urban service for the poor) — বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প। CDS এর সঙ্গে দরিদ্র পাড়ার পানীয় জল, ড্রেন, রাস্তা, শৌচাগার ও জঞ্জাল অপসারণ ছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে। এর নিয়ম বেশ কঠিন। যেমন, কাছাকাছি ১৫টি কাঁচা বাড়িতে যে দরিদ্র পরিবারগুলি NHG-র অন্তর্গত, সেখানে তৃণমূল স্তরে তাদের কমিটি এগুলি দেখাশোনা করবে। তাছাড়া পৌর প্রতিনিধিকে নিয়ে যে কমিটি আছে তার উপরে এই বিশাল অঙ্কের হিসাব ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১২৫টি পৌর সভাতে ২৮.১২ লক্ষ মানুষের বাস। এর মধ্যে ৪০টি পৌরসভা যুক্ত বৃহত্তর কলকাতাতে (কলকাতার পৌর নিগম ব্যতীত) এই প্রকল্প ২০০৩-২০১১র মধ্যে রূপায়িত হবে। এতে ব্রিটিশ সরকারের DFID (Department for International Development) এর মাধ্যমে ১০২.১০ মিলিয়ন পাউণ্ড বা ৭১৪৭ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। আশা করা হচ্ছে প্রায় ২৪ লক্ষ দরিদ্র শহরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পে সাতটি পাড়াতে পরিকাঠামোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এর জন্য প্রায় ১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

(৪) ওয়ার্ড কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করা

৭৪তম সংবিধান সংশোধনের পর পশ্চিমবঙ্গের পৌর আন্দোলনে এক বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে। বিকেন্দ্রীকরণ নীতির মাধ্যমে পৌরসভার প্রতি কাজে জনগণের প্রধিনিধিত্ব সফল রূপ দান সম্ভব হয়েছে। পৌর প্রতিনিধি, কাউন্সিলাররাও ওয়ার্ড কমিটিতে আছেন। সেখানে NHC থেকে তিন জন করে প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছে।

মানুষের ভোগ বিলাসের ক্রম অগ্রগতির সঙ্গে এই বিশ্বের পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার বিশ্বায়নের তাণ্ডবে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি দিন দিন দরিদ্রের কোঠায় নেমে যাচ্ছে। কিছু অনুদান দিয়ে এই দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা হলেও, তাতেও দাতাদের সদিচ্ছা থাকছে না। যদিও গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শহরে দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে, তাকে সফল রূপদান করতে পাওলো ফ্রেইরির গণসচেতনতাকে গ্রহণ করে এগোতে না পারলে বিপদের ভয় থেকেই যাবে। তার জন্যে এর প্রচার করার কাজও কর্মশালাগুলির একটি পদক্ষেপ হওয়া উচিত। না হলে বিশ্বায়নের বিষাক্ত বাতাবরণে দরিদ্র মানুষগুলি দারিদ্র্য রেখার উপরে কোনোদিন উঠলেও তাদের সঠিক মানসিক বিকাশ হবে না।

****

মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস

পাওলো ফ্রেইরি

[*অনুবাদ* : পাহাড়ী চৌধুরী]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পর্ব ঃ সাংস্কৃতিক প্রয়াস ও চেতনায়ন[১]

পৃথিবীতে অবস্থান ও পৃথিবীর সঙ্গে সহাবস্থান

চেতনায়নের[২] রূপরেখা সম্বন্ধে এখানে একটা বিশদ ও সুসম্বদ্ধ ব্যাখ্যা থাকা দরকার

জীব হিসেবে মানুষ সম্বন্ধে পর্যালোচনা প্রসূত উপলব্ধি দিয়েই ব্যাখ্যাটা শুরু করা যাক। মানুষ হল এমন এক ধরণের জীব, যাদের অবস্থান এই পৃথিবীতে। এবং এই পৃথিবীর সঙ্গে তারা সহাবস্থান করে। চেতনায়নের আবশ্যিক শর্ত হল, এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই তাদের কর্মের নিয়ামক অর্থাৎ চেতনাসম্পন্ন জীব হতে হবে। তাই চেতনায়ন, শিক্ষার মতোই, সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যতিক্রমহীন এক মানবিক প্রক্রিয়া। চেতনাসম্পন্ন জীব হিসেবে, মানুষ শুধুমাত্র পৃথিবীতে অবস্থান-ই করে না, অন্যান্য মানুষের সঙ্গে একত্রে পৃথিবীর সঙ্গে সহাবস্থানও করে। তাই, কাজের মাধ্যমে তারা এই পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে। আবার একই সঙ্গে, পৃথিবীর অবস্থানটা বুঝে নিয়ে, নিজেদের সৃজনশীল ভাষায় সেটা প্রকাশ করতে পারে। সংস্কারমুক্ত জীব হিসেবে, শুধুমাত্র মানুষই এই জটিল কাজটা করতে পারে।

মানুষ পৃথিবীর সঙ্গে সহাবস্থানের আবশ্যিক শর্তটা পূরণ করতে পারে। কারণ তারা পৃথিবীর সঙ্গে বস্তুগত দূরত্ব অর্জন করতে সক্ষম। এই বস্তুগত ভেদজ্ঞানের প্রক্রিয়ায়

---

[১]এই অংশটি পাওলো ফ্রেইরির 'Conscientization': Cultural Action for Freedom' শীর্ষক রচনার শেষাংশ। আগের অংশটি Harvard Educational Review পত্রিকার নভেম্বর, ১৯৭০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে অনুবাদ করেন লোরেন্টা স্লোভার।

[২]চেতনায়ন হল একটা প্রক্রিয়া বিশেষ। সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান মানুষের জীবনযাত্রার গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে। মানুষ এই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। এ বিষয়ে মানুষের উপলব্ধি বা সচেতনতার গভীর থেকে গভীরতর পর্যায়ে উত্তরণ ঘটে চেতনায়নের মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ সচেতনতার গ্রাহক বা প্রাপক নয়। সক্রিয় জ্ঞানান্বেষক হিসেবে মানুষ এই সচেতনতা অর্জন করে।

মানুষ নিজেকেও বস্তুজ্ঞানে সামিল করে। এই ভেদজ্ঞান ছাড়া, মানুষ আত্মজ্ঞান এবং পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারত না। পৃথিবীতে শুধুই অবস্থান করত।

মানুষের ক্ষেত্রে যা হয়, জীবজন্তুর ক্ষেত্রে তা হয় না। তারা নিজেদের বা এই পৃথিবীকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারে না। অনাদিকাল ধরে তারা একই ভাবে বেঁচে থাকে। মোদ্দা কথা হল, তারা তাদের জীবনধারার মধ্যে ডুবে থাকে, এই জীবনধারা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো সম্ভাবনাই তাদের নেই। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সমঝোতা করে, একেই তারা আঁকড়ে ধরে থাকে।

মানুষের ক্ষেত্রে এর উল্টোটা ঘটে। তারা বাস্তব অবস্থার প্রতি আসক্তিকে কাটিয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীতে শুধুমাত্র টিকে থাকার পর্যায়কে অতিক্রম করে যেতে পারে। জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। অস্তিত্বকে আরো বেশি অর্থবহ করে তুলতে পারে। এই ভাবেই, যারা বাস্তব অবস্থার রদবদল ঘটাতে পারে, নতুন কিছু হাজির করতে পারে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে, নিজেদের প্রকাশ করতে পারে, তাদের জীবনধারার উপযুক্ত শৈলী হয়ে ওঠে তাদের অবস্থান করা।

যে শুধুই বেঁচে থাকে, সে নিজের সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে পারে না। সে যে এই পৃথিবীতে আছে, তাই সে বুঝতে পারে না। যে এই পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলে, সে তার নিজের অস্তিত্বের পরিসীমার মধ্যে তার জীবনকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। চিন্তাভাবনা করে পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয় নিয়ে। তার অস্তিত্বের পরিসীমা ছড়িয়ে আছে তার কাজে, তার ইতিহাসে, তার সংস্কৃতিতে, তার মূল্যবোধে। এই পরিসরেই, মানুষ আধিপত্যবাদ ও স্বাধীনতার মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

পৃথিবীর প্রতি আসক্তিকে মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর আওতার বাইরে এসে, সচেতনার প্রতীক হিসেবে, তারা নিজেদের প্রকাশ করতে পারে। পৃথিবীকে বস্তু জ্ঞানে যাচাই করার মাধ্যমে এই সচেতনতা গড়ে ওঠে। তা যদি না হত, তবে মানুষ ভবিতব্যকেই মেনে নিত। স্বাধীনতার চিন্তা করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হত। তাদের ভাগ্য অন্যে ঠিক করে দিচ্ছে—এটা যারা বুঝতে পারে, এ নিয়ে যারা চিন্তাভাবনা করে, তারাই শুধু স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। তাদের চিন্তাভাবনার ফসল কোনো তথাকথিত অবাস্তব এবং নিষ্ফলা সচেতনতার গণ্ডির মধ্যে সীমায়িত থাকে না। এর প্রতিফলন ঘটে সুগভীর পরিবর্তনকামী প্রয়াসের অনুশীলনে। বাস্তবে নিয়ামক শক্তির ওপর প্রতিক্রিয়ায়। তাই বাস্তব সম্বন্ধে সচেতনতা আর বাস্তবের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হল পরিবর্তনকামী প্রয়াসের দুটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। এরাই মানুষকে সম্পর্ক[৩] সচেতন করে তোলে। মানুষের সচেতনতা এবং প্রয়াসের বিশেষত্ব হল মননশীলতা, উদ্দেশ্যমুখীনতা, নমনীয়তা এবং স্বকীয়তা[৪]। জীবজন্তুদের পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্রব শুধুই সংশ্রব মাত্র। পার্থক্যটা এখানেই।

[৩]মানুষের সম্পর্ক ও জীবজন্তুর সংশ্রবের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে পাওলো ফ্রেইরির Educacao como Practica da Liberdade দেখুন।

[৪]এই প্রেক্ষিতে, স্বকীয়তা বলতে মানবিক সচেতনতার সেই শক্তির কথাই বোঝানো হচ্ছে, যা

জীবজন্তুর সংশ্রব পর্যালোচনা সমৃদ্ধ নয়। তা শুধুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিগুলির সমাহার মাত্র। অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারকে তা ভরিয়ে তোলে না। তা বহুমাত্রিক নয়, একমাত্রিক। জীবজন্তুদের কোনো সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নেই। তারা তাদের অবস্থানেই নিমগ্ন হয়ে থাকে। তাই তারা অনড়।

সক্রিয়তা আর বস্তুগত ব্যবধান, বাস্তবকে বস্তুজ্ঞানে উপলব্ধি, বস্তুগত বাস্তবের ওপর মানুষের সক্রিয়তার তাৎপর্য। বস্তু সম্বন্ধে ভাষার মাধ্যমে সৃজনশীল যোগাযোগ, এক প্রতিবন্ধকতার বহুমুখী প্রতিক্রিয়া—এই বহুবিধ মাত্রা, পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে পর্যালোচনাজাত চিন্তাভাবনার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। মানুষের পৃথিবীকে বস্তুরূপে গ্রহণ করা এবং পৃথিবীর ওপরে তার ক্রিয়াশীলতা, এদের দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেই সচেতনতার জন্ম হয়। সচেতনতা মানে, অবশ্যই, বাস্তব অবস্থাকে নির্বিকার ভাবে উপলব্ধি করা নয়। সচেতনতা মানে, বাস্তব অবস্থার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা।[৫]

পৃথিবী ছাড়া চৈতন্যের বিকাশ সম্ভব নয়। পৃথিবীই চৈতন্যের স্রষ্টা। এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে একথাও ঠিক, যে চৈতন্যের বিকাশকালে যদি পৃথিবী নিজেই তার সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার বিষয়বস্তু হয়ে না উঠত তবে এই পৃথিবীই বিকশিত হত না। যান্ত্রিক বস্তুবাদ মানুষের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। তাই এর পক্ষে মানুষ এবং পৃথিবী সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। একই ভাবে অধ্যাত্মবাদও মানুষ এবং পৃথিবী সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কারণ এই তত্ত্ব পৃথিবীর অস্তিত্বকে স্বীকার করে না।

যান্ত্রিক বস্তুবাদে, চৈতন্য বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবের অনুলিপি মাত্র। অধ্যাত্মবাদে, পৃথিবীকে লঘু করে চৈতন্যের খামখেয়ালি সৃষ্টিমাত্র মনে করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে, চৈতন্যের পক্ষে বাস্তব অবস্থানকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যেহেতু চৈতন্য বাস্তবের স্রষ্টা, তাই এর অবস্থান বাস্তবের আগে। কোনো ক্ষেত্রেই মানুষ বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে না। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অসম্ভব। কারণ সে ক্ষেত্রে, বস্তুর প্রতিলিপি বা প্রতিচ্ছবি হওয়ায়, চৈতন্য বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান। অতএব বাস্তব নিজে থেকেই[৬]

বস্তুগত রূপরেখার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যেতে অক্ষম। এই স্বকীয় উদ্দেশ্যমুখীনতাকে বাদ দিয়ে, ধরা ছোঁওয়ার বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সচেতনতা অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন, আমায় লেখার টেবিল কীভাবে আমাকে গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখে, সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। কারণ, এই সীমাবদ্ধতাকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু করে, আমি একে কাটিয়ে উঠতে পারি।

[৫]'মানুষ যুক্তিবাদী জীব', বলেছেন অ্যারিস্টট্‌ল। আজকের দিনে আমরা আরো পরিষ্কার করে বলতে চাই, 'মানুষ চিন্তাশীল জীব'। জোর দিতে চাই তার গুণমানের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের ওপর। যা তার অনড়, বিক্ষিপ্ত চৈতন্যকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করেছে। যা তাকে আত্মোপলব্ধিতে সমর্থ করেছে। মানুষ শুধুই 'এমন জীব, যে জানে' নয়। মানুষ হল 'এমন জীব, যে জানে, যে, সে জানে'। অধিগত চৈতন্য যদি তার বর্গশক্তিতে রূপান্তরিত হয়....... আমরা কি কেউ সেই পরিবর্তনের মৌলিক চরিত্রটা যথেষ্ট অনুভব করতে পারি? — পিয়েরি টেইল হার্ড দ্য সার্ডিন তাঁর The Appearance of Man বইতে এই কথা লিখেছেন।

[৬]'Thesis on Feuerbach' (3) এর একটি প্রবন্ধে, মার্ক্‌স, বাস্তব নিজে থেকে পরিবর্তিত হওয়ার তত্ত্বকে বাতিল করেছেন। কার্ল মার্ক্‌সের Selected Writings in Sociology

বদলে যায়। একই ভাবে, অধ্যাত্মবাদী তত্ত্বও পরিবর্তনশীল বাস্তবের ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না। এতে বাস্তব জিনিষটাই কল্পনামাত্র। কাজেই কাল্পনিক কোনো কিছুর পরিবর্তনের প্রশ্নটাই অবান্তর। অতএব, চৈতন্য সম্বন্ধে দুধরনের ধারণার কোনোটিতেই সত্যিকারের পর্যানুশীলনের সুযোগ নেই। বিষয় এবং বস্তুর দ্বন্দ্ব যেখানে বর্তমান,[৭] শুধু সেখানেই পর্যানুশীলন সম্ভব।

মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্কের যে দ্বন্দ্ব, আচরণবাদে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। যান্ত্রিক আচরণবাদের আঙ্গিকে মানুষকে অস্বীকার করা হয়। এই আঙ্গিকে মানুষ যন্ত্রমাত্র। যুক্তিনিষ্ঠ আচরণবাদও মানুষকে অস্বীকার করে। এতে মানুষের চৈতন্য শুধুই বিমূর্ত কল্পনামাত্র।[৮]

মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক সম্বন্ধে এই অস্বচ্ছ ধারণা নিয়ে 'চেতনায়ন' প্রক্রিয়ার পত্তন করা যায় না। মানুষের চেতনার সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু মানুষ সেই সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করতে পারে। শুধুমাত্র এই কারণেই 'চেতনায়ন' সম্ভবপর। পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় মানুষ যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় চেতনার এই গুরুত্বপূর্ণ মাত্রাটিতে। মানুষ তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছোতে সক্ষম। তাই কেবল মানুষই কাজ শুরু করার আগেই কাজের ফলাফল কল্পনা করতে পারে। তারা পরিকল্পনা করতে পারে। মার্কস্ তাঁর Capital-এ পরিষ্কার করে বলেছেন ঃ

আমরা শ্রমের সেই ধারাটির কথা বলছি, যা শুধুমাত্র মানুষের সম্পদ হিসেবেই চিহ্নিত। মাকড়সার কাজের সঙ্গে তন্তুবায়ের কাজের সাদৃশ্য আছে। মৌমাছির চাক তৈরি একজন স্থপতিকে লজ্জা দেয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ মৌমাছির সঙ্গে নিকৃষ্টতম স্থপতির পার্থক্য এখানেই, যে স্থপতি বাস্তবে কাজ শুরু করার আগেই কল্পনায় তার সৃষ্টিকে দেখতে পায়।

দক্ষ বিশেষজ্ঞ হিসেবে মৌমাছিরা জানে কোন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু তারা তাদের পছন্দের হেরফের ঘটাতে পারে না। তারা কোনো বাড়তি জিনিষ (বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত) তৈরি করতে পারে না। এই পৃথিবীতে তাদের কাজের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। নেই কাজ নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা। যা হল কিনা মানুষের কাজের বিশেষত্ব। জীবজন্তুরা টিকে থাকার জন্যে নিজেদেরকে পৃথিবীর উপযুক্ত করে বদলে নেয়। মানুষ আরো ভালো করে থাকার জন্যে পৃথিবীকে বদলে নেয়। জীবজন্তুদের

---

and Social Philosophy দেখুন।

[৭]একটি সাংস্কৃতিক চক্রে মানুষ এবং পৃথিবীর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। চিলির এক কৃষক বললেন, 'এখন আমি বুঝি যে, মানুষ ছাড়া পৃথিবী হয় না।' যখন শিক্ষক বললেন, 'ধরা যাক সব মানুষ মারা গেল। তখনো গাছ, জীবজন্তু, পাখি, নদী এবং তারারা রয়ে গেল। সেটা কি পৃথিবী হবে না?' 'না', কৃষক জবাব দিলেন, 'কারণ তখন এটাকে পৃথিবী বলার জন্যে কেউ থাকবে না।'

[৮]আমরা জন বেলফের The Existence of Mind বই-এ আলোচিত আচরণবাদের কথা বলছি।

সামনে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। তাদের পছন্দ-অপছন্দের কোনো বালাই নেই। শুধু টিকে থাকার জন্যেই তারা নিজেদেরকে বদলায়। তারা পৃথিবীকে 'জান্তব' করে তুলতে পারে না। পৃথিবীর 'জান্তবীকরণ'-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত জন্তুদের 'জান্তবীকরণ'। যার পূর্ব শর্ত হল জন্তুদের এই চেতনা থাকতে হবে, যে তারা অপূর্ণ। এই চেতনাই তাদের বরাবরের জন্যে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াবে। আসলে অবশ্য, মৌমাছিরা যখন তাদের মৌচাক গড়ে তোলে বা মধু তৈরি করে, তখনও তারা পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্রবের ক্ষেত্রে মৌমাছি-ই থাকে। তাদের মৌমাছিত্বে[১] কোনো কম-বেশি হয় না। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই।

পর্যালোচনাকারী জীব হিসেবে, মানুষের কাছে পৃথিবীকে বদলানো মানে পৃথিবীর মানবিকীকরণ। এমন কি পৃথিবীর মানবিকীকরণে যদি মানুষের মানবিকীকরণ সূচিত না হয় তবুও। এর মানে হল পৃথিবীকে মানুষের কৌতূহলী এবং উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন উপস্থিতি দিয়ে ভরিয়ে তোলা। তার ওপরে নিজের কাজের দাগ রেখে যাওয়া। পৃথিবীকে বদলানোর প্রক্রিয়ায় মানুষের উপস্থিতি প্রকাশিত হয়। এই প্রক্রিয়া তাকে মানবিকীকরণ-এর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে মানবিকতা বর্জনের দিকে। মানবিকতার হ্রাস বা বৃদ্ধির দিকে। এই বিকল্পগুলি মানুষের কাছে তার সংশয়ী চরিত্রটা তুলে ধরে। তার কাছে সমস্যা হয়ে ওঠে। তাকে যে কোনো একটা পথ বেছে নিতে হয়। প্রায়শ, এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই মানুষ এবং তার পছন্দ করার স্বাধীনতাকে ঘিরে থাকে। তবুও, যেহেতু মানুষ তার চিন্তাশীল অস্তিত্ব দিয়ে পৃথিবীকে ভরিয়ে তোলে, তাই কেবল তারাই মানবিকীকরণ বা মানবিকতা বর্জন করতে পারে। মানবিকীকরণ হল তাদের স্বপ্ন। মানবিকতা বর্জনের প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করার মধ্যে দিয়ে তারা এই কথাটাই ঘোষণা করে।

চিন্তাশীলতা এবং পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের শেষ কথা সম্ভব হত না, যদি এই সম্পর্কের ঐতিহাসিক তথা বস্তুগত প্রাসঙ্গিকতা না থাকত। বিশ্লেষণী চিন্তা ছাড়া কোনো শেষ কথা হয় না। বিরামবিহীন জাগতিক ঘটনাবলীকে বাদ দিয়ে কোনো শেষ কথাও অর্থহীন। মানুষের কাছে এমন কোনো 'এখান' বা 'সেখান' নেই, যার সঙ্গে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান জড়িয়ে নেই। তাই মানুষের নিজের মতোই, পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্কও নিজেই ঐতিহাসিক।

ইতিহাস মানুষ তৈরি করে। মানুষ সেই ইতিহাসকেই তৈরি করে। শুধু তাই নয়, মানুষ এই পরস্পরকে তৈরি করার ইতিহাসটাও মনে রাখে। টেইলহার্ড দ্য সার্ডিন বলেছেন, বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় পোড় খেতে খেতে, মানুষ তার জীবনের ঘটনাবলীকে মনে রাখতে পারে। এর বিপরীতে, জীবজন্তুরা সময়ের মধ্যে ডুবে থাকে। এই সময় তাদের নয় এই সময় মানুষের।

পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং জীবজন্তুর সংশ্রবের মধ্যে আরো একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। শুধুমাত্র মানুষই কাজ করে। যেমন, মানুষ যা করে, ঘোড়া তা পারে না।

[১] Ortega y Gasset এক জায়গায় বলেছেন, 'বাঘ নিজের বাঘত্ব ছাড়তে পারে না'

মার্ক্স মৌমাছির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'প্রতিটি শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়ার শেষে আমরা যে ফল পাই, তা কাজ শুরু করার সময়েই শ্রমিকের কল্পনায় ছিল' (Capital দেখুন)। এই মাত্রাকে বাদ দিয়ে যে ক্রিয়া তা কাজ নয়। মাঠেই হোক আর সার্কাসেই হোক, আপাতদৃষ্টিতে যা ঘোড়ার কাজ বলে মনে হয়, আসলে তা মানুষের কাজের প্রতিফলন। ক্রিয়াশীল জীবের কায়িক প্রচেষ্টা বেশি বা কম হওয়ার ওপরে সেই ক্রিয়ার কাজ হয়ে ওঠা নির্ভর করে না। নির্ভর করে নিজের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কর্তার সচেতনতার ওপর। পরিকল্পনাধীন ক্রিয়ার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সচেতনতা; যন্ত্রপাতি তৈরি করা এবং ক্রিয়ার অন্তর্গত বিষয় ও নিজের মধ্যে ক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে তাদের ব্যবহার করা সম্বন্ধে সচেতনতা; ক্রিয়ার উর্দ্দেশ্য থাকা সম্বন্ধে সচেতনতা; ক্রিয়ার ফলাফল আন্দাজ করা সম্বন্ধে সচেতনতা। এ ছাড়াও ক্রিয়াকে কাজ হয়ে উঠতে হলে, তার ফলাফল তাৎপর্যপূর্ণ কিছু হওয়া চাই; যা হবে ক্রিয়ার সক্রিয় উপাদানে থেকে অসম্পূর্ণ আলাদা; যা কর্তাকে প্রভাবিত করবে; তার চিন্তার বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে।[১০] মানুষ পৃথিবীর বুকে ফলপ্রসূ কাজ করে। এর বিপরীতে, তার চেতনাও পর্যানুশীলনের বিপরীত ক্রিয়ার মাধ্যমে ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ভাবে প্রভাবিত হয়। এই প্রভাবের গুণমানের মাত্রা অনুযায়ী মানুষের চেতনা সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্তরে পৌঁছেয়। চেতনায়নের প্রক্রিয়াটিকে বোঝার পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবার জন্যে আমরা চেতনার এই স্তরগুলি বিশ্লেষণ করতে চাই।

---

[১০]মানুষের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটাই হল আসল কথা। পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক থেকেই পৃথিবীর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা বোঝা যায়। তাই, কায়িক শ্রমের কাজ আর মস্তিষ্কের কাজের মধ্যে সনাতন আভিজাত্যের পার্থক্য আসলে অলীক কল্পকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। সব কাজেই গোটা মানুষটাই নিয়োজিত হয়। তার কোনো অংশবিশেষ নয়। আমাদের এই প্রবন্ধ লেখাকে যেমন হাতের কাজ বা মস্তিষ্কের কাজ হিসেবে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না তেমনিই কারখানায় যিনি কাজ করেন তাঁর কাজকেও কায়িক শ্রমের কাজ বা মস্তিষ্কের কাজ হিসেবে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। বিভিন্ন কাজের মধ্যে তফাৎ একটাই। তা হল কোন কাজে কোন ধরনের শক্তি বেশি লাগে। পেশি ও স্নায়ুর শক্তি, না মস্তিষ্কের শক্তি। এ বিষয়ে অ্যান্টনিও গ্রামশি-র Cultura y Literatura দেখুন।

হুগলি জেলায় প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচির মূল্যায়ন : একটি অভিজ্ঞতা

অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়

হুগলি জেলায় প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচি চলছে ২০০০ সালের শেষ থেকেই। জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের অনুমোদন-পত্র পাওয়া যায় জুলাই, ২০০০ সালে। কিন্তু অর্থপ্রাপ্তি একটু দেরিতেই ঘটে। তা পাওয়া যায় ১২.৯.২০০০ তারিখে। ১৯৫৯টি জনশিক্ষা কেন্দ্র ও মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্র ২১৮টি, মোট ২১৭৭টি অনুমোদিত হয়। জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের পদ্ধতি অনুসারে ঐ সময় থেকেই প্রথম বর্ষের কার্যকাল শুরু ধরতে হবে। অবশ্য প্রাথমিক সাক্ষরতা ও সাক্ষরোত্তর পর্বের পরই ১৯৯৯ সাল থেকেই অর্থাৎ প্রবহমান শিক্ষার প্রকল্প রচনার প্রস্তুতি কাল থেকেই জেলার শিক্ষা-চর্চা কেন্দ্রগুলি বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে প্রবহমান শিক্ষার মূল দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সাক্ষরতা সচেতনতাও সক্ষমতার বিষয়কে সামনে রেখে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। প্রাথমিক ভাবে যা যা করণীয় অর্থাৎ কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন, সমীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রের অংশগ্রহণকারীদের চিহ্নিত করণ, অনুপ্রেরক ও মুখ্য অনুপ্রেরক নির্বাচন, সকল স্তরের আবাসিক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদির জন্য কিছু সময় ব্যয় হলেও জনশিক্ষাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচি চলছে প্রায় তিন বছর হল। কিন্তু দ্বিতীয় বছরের প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ না পাওয়াতে দীর্ঘদিন প্রথম বছরের কর্মকালের মধ্যেই থাকতে হয়েছে। কিন্তু কেমন চলছে? জেলা সাক্ষরতা সমিতির কোর কমিটি এই বিষয়ে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করে এবং ঠিক হয় যে পড়া-লেখার কাজের মূল্যায়ন হবে এবং প্রবহমান শিক্ষার বহুমুখী কাজগুলি কেমন বা কীভাবে রূপায়িত হচ্ছে তারও মূল্যায়ন করা হবে। রাজ্য জনশিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্তা মন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী নন্দরাণী ডল মহাশয়ার জেলা পরিদর্শন কালে এই বিষয়টি তাঁর উপস্থিতিতেই পুনরায় আলোচিত হয়। তিনিও এই মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং রাজ্য সাক্ষরতা মিশনের কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। সেই অনুসারে পঃ বঃ রাজ্য সাক্ষরতা মিশনের কাছে জেলা সাক্ষরতা সমিতির পক্ষ থেকে প্রথম বছরের কাজের (প্রকল্প অনুসারে) মূল্যায়ন করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের প্রকল্প নির্দেশিকায় কেবলমাত্র ২য় বৎসর, ৪র্থ বৎসর ও ৭ম বৎসরের শেষে বহির্মূল্যায়নের উল্লেখ আছে। এরূপ অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন এর আগে কোনও জেলায় অনুষ্ঠিত হয়নি। রাজ্য সাক্ষরতা মিশন জেলার এই প্রস্তাব বিবেচনা করে জানায় যে, যদিও জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের

এরূপ কোনো নির্দেশ নেই এবং কোনো জেলাই এরূপ কোনো মূল্যায়ন করেনি তবুও এই প্রস্তাবটি কার্যকরী করা যেতে পারে এবং এখনই এর উপযুক্ত সময়। রাজ্য সাক্ষরতা মিশনের প্রস্তাব মতো এই মূল্যায়নকে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হিসাবে বিচার করে একটি মূল্যায়ন পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়। এবং রাজ্য সাক্ষরতা মিশন ও জেলা সাক্ষরতা সমিতির যৌথ উদ্যোগে মূল্যায়নের কাজ আরম্ভ করা হয়। রাজ্য উপকরণ কেন্দ্রের প্রাক্তন অধিকর্তা ও রাজ্য সাক্ষরতা মিশনের অন্যতম সদস্য মাননীয় শ্রী মিহির ঘোষ-দস্তিদার মহাশয়ের নেতৃত্বে এই কমিটি দুবার আলোচনায় মিলিত হয় এবং বিশেষ কয়েকটি বিষয়কে সামনে রেখে মূল্যায়নের রূপরেখা প্রস্তুত করে। বিবেচ্য বিষয়গুলি হল ঃ—

ক) এই মূল্যায়নের জ্ঞাতব্য হবে—

(১) জেলার জনশিক্ষা কেন্দ্রগুলির বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশ কেমন?

(২) কেন্দ্রগুলি প্রবহমান কেন্দ্র হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা?

(৩) উপকরণ যা যা সরবরাহ করা হয়েছে তার ব্যবহার কেমন হচ্ছে ও কীভাবে হচ্ছে?

(৪) প্রতিটি কেন্দ্রে গ্রন্থাগারের ব্যবহার যথার্থ-ভাবে হচ্ছে কিনা?

(৫) এই সময় কালের মধ্যে আবাসিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে তিনদিনের আবাসিক কর্মশালা হয়েছে। সর্বস্তরের আধিকারিক ও ব্লক-পৌরসভার পরিচালকদের নিয়ে কর্মশালা হয়েছে। সাংস্কৃতিক জাঠা সহ খেলাধূলারও আয়োজন করা হয়েছে। সুতরাং মূল্যায়নকালে এসবের প্রভাব কেন্দ্রের নানা কাজের মাধ্যমে কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তাও বিচার করা হবে। বিচার করা হবে জনগণের অংশগ্রহণ কতটা, কেন্দ্রের অংশগ্রহণকীরাদের সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ কতটা এবং এলাকায় এর প্রভাব কেমন?

(৬) কেবলমাত্র পঠন-পাঠনে অংশগ্রহণকারীদের মান নির্ধারণ নয়, সামগ্রিক ভাবে প্রবহমান শিক্ষার বহুমুখী কাজেরও মূল্যায়ন হবে। অর্থাৎ জনশিক্ষা কেন্দ্রের মান মূল্যায়ন করা হবে।

(খ) এই মূল্যায়নের মাধ্যমে জনশিক্ষা কেন্দ্রগুলির অগ্রগতি ও দুর্বলতা নির্ধারণ ও চিহ্নিতকরণ যেমন হবে তেমনি উন্নত ও পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলিকেও চিহ্নিত করা হবে।

(গ) এই মূল্যায়নের ভিত্তিতেই আগামীদিনে জেলার কর্মসূচিও নির্ধারণ করা সহজ হবে বিশেষত ২য় বৎসরের প্রকল্প প্রস্তুতি ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে।

■ এই সিদ্ধান্তগুলিকে সামনে রেখে মূল্যয়নের অন্যান্য বিষয় ঠিক করা হয়। যেমন—

❖ মূল্যায়ন বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ওড়িয়া ও তেলেগু এই পাঁচ ভাষারই হবে। পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে সাক্ষরতা ও সাক্ষরোত্তর এই দুটি ভাগের অংশগ্রহণকারীদেরই করা হবে।

❖ মূল্যায়ন পরপর তিনদিন (১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫) একত্রে জেলার সব কেন্দ্রেই হবে। প্রথম দিনে কেবল পঠন-পাঠনে অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন হবে। অন্য দুদিনে কেন্দ্রের নানা দিকের মূল্যায়ন হবে। এই অনুসারে মূল্যায়ন-পত্র রচনা করা হবে।

❖ দুদিন ধরে যে কেন্দ্রের নানা দিকগুলির মূল্যায়ন হবে তার দিকগুলি হবে যথাক্রমে —

১। জনশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন —

ক) কেন্দ্রের স্থান ও পরিবেশ —	মোট মান — ১০
খ) কেন্দ্রের সাজ সরঞ্জাম —	" — ১০
গ) বইপত্র সহ গ্রন্থাগারের অন্যান্য উপকরণ	" — ১০
ঘ) কর্মিবাহিনী ও প্রশিক্ষণ —	" — ১০
	মোট — ৪০

২। মূখ্য কাজগুলি	— ৩০
৩। বাদছুটদের সাক্ষরতা চর্চা	— ২০
৪। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ	— ১০

সর্ব মোট মান ১০০ ধরে মান বিচার করা হবে।

(নমুনাপত্র দেওয়া হল পরিশিষ্ট - ১-এ)

❖ আরো ঠিক হয় যে সমগ্র মূল্যায়ন পদ্ধতি কর্মশালার মাধ্যমে সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

প্রস্তুতি পর্ব সারার পর মূল্যায়নের নির্ধারিত সময়ের প্রায় একমাস পূর্বেই জেলায় একটি কেন্দ্রীয় কর্মশালা করা হয়। ঐ কর্মশালায় পরিচালন কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে জেলার প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, কর্মাধ্যক্ষ, পৌরসভার পৌরপ্রধানসহ অন্যান্য পদাধিকারীগণ, প্রতিটি অঞ্চলের সমন্বয়কারী, জেলার সকল সম্পদ কর্মী ও অন্যান্য বিশিষ্টদের মুল্যায়নের সকল বিষয়ে অবহিত করা হয় ও ব্যাখ্যা করা হয়। অনুরূপভাবে পঞ্চায়েত সমিতি ও পৌরসভা স্তরেও অনুপ্রেরক, মূখ্য অনুপ্রেরক, কেন্দ্র পরিচালন কমিটির সদস্য ও অন্যান্য সহযোগীদের উপস্থিতিতে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

মূল্যায়ন পরিচালন কমিটির হাতে জেলার সব কটি কেন্দ্রের অঞ্চল ভিত্তিক তথ্য সহ তালিকা তুলে দেওয়া হয়। ঠিক হয় জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসারে চালু ২১৬৯টি জনশিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ৫৫টি কেন্দ্রের মূল্যায়ন সরাসরি মূল্যায়ন কমিটি করবে এবং অন্য ২১১৪টি কেন্দ্রের মূল্যায়ন কমিটির পরিচালনায় জেলা-সম্পদ কর্মীদের মাধ্যমে করা হবে। তবে কোনো সম্পাদ-কর্মীই তার নিজ অঞ্চলের মূল্যায়নের দায়িত্বে থাকবেন না—তাঁদের কাছাকাছি স্থান বদল করে এই দায়িত্ব পালন করানো

হবে। ঐ ৫৫টি কেন্দ্রকে বাছাই নমুনা কেন্দ্র হিসাবে ধরা হবে। এমন ভাবে বাছাই করা হবে যাতে প্রতিটি অঞ্চলেরই কেন্দ্র থাকে। এই মূল্যায়নের কাজ পরিচালনা ও নমুনা (বাছাই) কেন্দ্রের মূল্যায়ন করার জন্য কমিটির সদস্য ছাড়াও রাজ্য উপকরণ কেন্দ্রের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট কয়েকজনকে যুক্ত করে ৯টি দল গঠন করা হয়। তিনদিন ধরেই এই দল তাঁদের নির্ধারিত অঞ্চলে থেকেই নমুনা (বাছাই) কেন্দ্রের মূল্যায়ন যেমন করবেন সাথে সাথে অন্য কেন্দ্রগুলির মূল্যায়ন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন ও সাহায্য করবেন (৯টি দলের তালিকা দেওয়া হল পরিশিষ্ট-২-এ)। এছাড়া প্রতিটি পঞ্চায়েত ও পৌরসভার আধিকারিকগণ এই মূল্যায়ন পরিচালনার সকল দায়িত্ব পালন করবেন আঞ্চলিক কমিটি, কেন্দ্র কমিটি ও বঙ্গীয় সাক্ষরতা সমিতির স্বেচ্ছাসেবক কর্মী ও সংগঠকদের সাহায্য নিয়ে।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ জেল পরিষদের কার্যালয়ে জেলা কোর কমিটি ও মূল্যায়ন পরিচালন কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে এবং প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পৌরসভার পৌরপ্রধান ও অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সমগ্র মূল্যায়ন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পরিচালনার কাজগুলিরও আলোচনা করা হয়। এই সভাতেই প্রতিটি অঞ্চলের মূল্যায়ন পত্রের সিলকরা প্যাকেট তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং কোন কোন কেন্দ্রগুলি নমুনা (বাছাই) কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাও তাঁদের জানানো হয়। নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে মূল্যায়ন সম্পূর্ণ করা ও জেলা কেন্দ্রে তা পৌছানোর সকল দায়িত্ব ও ব্যবস্থা আঞ্চলিক স্তরের। জেলার সাথে তাঁরা সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে এই মূল্যায়ন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবেন বলে সভায় স্থির করা হয়।

এর পর সমগ্র জেলায় ১৫ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়। জেলার কেন্দ্রীয় মূল্যায়নকারীদের দ্বারা ৫০টি নমুনা জনশিক্ষা কেন্দ্র ও ৫টি নমুনা মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্রের মূল্যায়ন সহ ২১১৪টি জনশিক্ষা ও মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্রের (মোট ২১৬৯টি) মূল্যায়ন সম্পূর্ণ করে, জেলায় সংকলন করা হয়। এর পর কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন কমিটি ঐ সব কেন্দ্রের ফলাফল পর্য্যালোচনা করেন। কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন কমিটির অন্যতম সদস্য মাননীয় অধ্যাপক অনিরুদ্ধ চৌধুরীর তত্বাবধানে কেন্দ্রগুলির মূল্যায়ন-লব্ধ ফল জেলাস্তর থেকে আঞ্চলিক স্তর পর্যন্ত পর্য্যালোচনা করে তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। এই প্রতিবেদনে মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত বিশেষ দিকগুলিকেও নির্ধারণ করা হয়।

এই বিশ্লেষনে দেখা যায় যে ১৮টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ২টি পঞ্চায়েত সমিতি ধনিয়াখালি ও শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া এবং ৬টি পৌরসভার মধ্যে ২টি পৌরসভা তারকেশ্বর ও শ্রীরামপুরের মান অন্যদের তুলনায় কম যথাক্রমে ৫০% ও ৪০%। এই প্রতিবেদন অনুসারে এই অঞ্চলগুলিকে পরবর্তীকালে বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নত করতে হবে।

(খ) কেন্দ্রগুলির মূল্যায়ন পর্য্যালোচনা করে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বা সবলতা ও দুর্বলতার দিকগুলি পাওয়া গেল সেগুলির প্রতি বিশেষ নজর বা গুরুত্ব দিতে হবে পরবর্তী কালে। সেগুলি হল যথাক্রমে —

(১) উল্লেখ্য অগ্রগতি :

— সুসংহত পরিকল্পনা
— নেতৃত্ব ও কর্মীদের ধারণার স্বচ্ছতা
— অনুপ্রেরকদের আবাসিক প্রশিক্ষণ
— কেবল সাক্ষরতা নয়, জনশিক্ষা কেন্দ্রে গ্রন্থাগার, চর্চামণ্ডল, সাংস্কৃতিক কাজের প্রয়াস
— বহু ভাষায় কাজ
— সংগঠিত প্রচার জাঠা
— লোকশিল্পীদের কর্মশালা
— কিছু স্বেচ্ছাশ্রম - নির্ভর সহায়ক শিক্ষাকেন্দ্র
— জাতীয় স্তরের একটি প্রশিক্ষণের সুষ্ঠু আয়োজন

(২) যে সব দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে :

— জেলা, ব্লক ও পৌর-কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা
— তদারকি ব্যবস্থাকে গতিশীল করা
— তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য আদান প্রদান সুষ্ঠুভাবে করা
— জনশিক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে বিকাশ বিভাগগুলির সংযোগ
— জেলার নিজস্ব উদ্যোগে পত্রিকা, পুস্তিকা প্রকাশ
— কেন্দ্রভিত্তিক গ্রন্থাগারকে আরও সংগঠিত রূপ দেওয়া
— জনস্বাস্থ্য ও নিবিড় স্বাস্থ্য বিধানের কাজটিকে আরও গুরুত্ব দেওয়া
— পঞ্চায়েত ও পৌরসভার উন্নয়নমূলক কর্মসূচির আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে প্রবহমান শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি
— জনশিক্ষাকে গণ-আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলা।

***

পরিশিষ্ট — ১

রাজ্য সাক্ষরতা মিশনের সহযোগিতায় হুগলি জেলায় প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচির অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন (১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)

জনশিক্ষা কেন্দ্রের নাম ____________________

অনুপ্রেরক / মুখ্য অনুপ্রেরকের নাম ____________________

গ্রাঃ পঃ / ওয়ার্ড নং ____________________

পঃ সমিতি / পৌরসভা ____________________

।। জনশিক্ষা কেন্দ্র / মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্রের মূল্যায়ন-পত্র।।
(অতিরিক্ত তথ্য সহ)

১। জনশিক্ষা কেন্দ্র / মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে : প্রাপ্ত নম্বর (Score)

	০	১	২	৩	৪	৫
(ক) কেন্দ্রের স্থান ও পরিবেশ :(অস্তিত্ব, মান প্রভৃতি)						
(i) কেন্দ্র ঘর : এলাকার অবস্থা অনুসারে কতটা উপযোগী						
(ii) কেন্দ্র ঘর নির্বাচনে এলাকার মানুষের মতামত গ্রহণ						
(iii) কেন্দ্রের নাম-ফলক						
(iv) কেন্দ্রের ভেতর ও আশপাশের পরিচ্ছন্নতা						
(v) কেন্দ্র ঘরটি চার্ট, পোস্টার, ছবিতে কতটা সুসজ্জিত						
(vi) গ্রন্থাগারের বই, কাগজ-পত্র সাজিয়ে রাখা ও আলোচনাচক্রের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান						
(vii) কেন্দ্রে আলো, জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা						
(viii) স্থানীয় এলাকায় প্রবহমান শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ কেমন						
সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর						

কেন্দ্রের স্থান ও পরিবেশ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনও বিষয় :

	০	১	২	৩	৪	৫
সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের গড় :						

প্রাপ্ত নম্বর (Score)

(খ) কেন্দ্রে সাজ-সরঞ্জাম : (অস্তিত্ব, সংখ্যা, মান প্রভৃতি)	০	১	২	৩	৪	৫
(i) আলমারি / ট্রাঙ্ক / বইয়ের র‍্যাক						
(ii) চেয়ার / টেবিল / মাদুর / চাটাই						
(iii) ব্ল্যাকবোর্ড / অন্য কোনও বোর্ড						
(iv) হ্যারিকেন / আলোর অন্য কোনও ব্যবস্থা						
(v) হাজিরা খাতা, গ্রন্থাগারের খাতা, আলোচনা সভার ও অন্যান্য খাতা						
(vi) সাইকেল						
(vii) গানের সরঞ্জাম (হারমোনিয়াম / মাদল / ঢোল / অন্য কিছু)						
(viii) খেলার সরঞ্জাম (ফুটবল / ভলিবল / ক্যারাম / অন্য কিছু)						
(ix) দৈনন্দিন শিক্ষা-উপকরণ (বই / খাতা / চক / অন্যান্য)						
(x) অডিও ক্যাসেট / গ্লোব / রেডিও ইত্যাদি						
(xi) এই সব সরঞ্জাম কতটা কাজে লাগছে						
আর কী কী সরঞ্জাম দিলে কেন্দ্র চালাতে সুবিধা হবে? — সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর						

সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের গড় :	০	১	২	৩	৪	৫

প্রাপ্ত নম্বর (Score)

(গ) বই-পত্র ও গ্রন্থাগারের অন্যান্য উপকরণ :	০	১	২	৩	৪	৫
(i) স্বল্প সাক্ষরদের গ্রন্থাগারের জন্য বই সরবরাহ ০/১-১০/১১-২০/২১-৩০/৩১-৪০/৪০ এর বেশি শিরোনাম						
(ii) কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত কোনও ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার / সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং তার সক্রিয়তা						
(iii) কেন্দ্রে নিয়মিত দৈনিক সংবাদপত্র / সাময়িক পত্রিকার সরবরাহ						
(iv) কেন্দ্রে বিকাশ বিভাগের / পঞ্চায়েত / পৌরসভার পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকার নিয়মিত সরবরাহ						
(v) কেন্দ্রের নিজস্ব উদ্যোগে প্রস্তুত কোনও উপকরণ / দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ / নোটিশ বোর্ড						

গ্রন্থাগারের জন্য প্রতিটি শিরোনামের বই কত কপি করে দেওয়া হয়েছে? :

সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর

আর কী কী উপকরণ দিলে গ্রন্থাগার পরিচালনায় সুবিধা হবে?

সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের গড় :

০	১	২	৩	৪	৫

প্রাপ্ত নম্বর (Score)

(ঘ) কর্মী বাহিনী ও প্রশিক্ষণ :	০	১	২	৩	৪	৫
(i) কেন্দ্রে কর্মরত অনুপ্রেরক / সহ-অনুপ্রেরকের সাক্ষরতা / সাক্ষরোত্তর পর্যায়ের কাজের অভিজ্ঞতা						
(ii) কর্মী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণ ও স্থানীয় স্তরের কমিটির মতামতের গুরুত্ব						
(iii) কর্মরত অনুপ্রেরক / সহ-অনুপ্রেরকের প্রশিক্ষণ ও তার মান						
(iv) তত্ত্বাবধায়ক, মুখ্য অনুপ্রেরক ও ব্লক / পৌর-সমন্বয়কারীর প্রশিক্ষণ ও তার মান						
(v) প্রবহমান শিক্ষা সম্পর্কে স্থানীয় কমিটির সদস্য / সংগঠকদের অভিমুখীকরণ ও তার মান						
(vi) প্রবহমান শিক্ষা কী, কেন, কীভাবে - এ সম্পর্কে কর্মীদের ধারণার স্বচ্ছতা						
সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর						

প্রবহমান শিক্ষা ও তার কর্মধারা সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে কর্মীদের ঘাটতি আছে?

সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের গড় :

০	১	২	৩	৪	৫

২। মুখ্য কাজগুলি সম্পর্কে :

প্রাপ্ত নম্বর (Score)

(অস্তিত্ব, কাজের ধরন, মান, জন-অংশগ্রহণ প্রভৃতি)	০	১	২	৩	৪	৫
(i) স্বল্প সাক্ষরদের গ্রন্থাগার						
(ii) কেন্দ্রে বইয়ের তালিকা, গ্রন্থাগারের সদস্য-তালিকা, বই আদান-প্রদানের তথ্যের যথাযথ সংরক্ষণ						
(iii) কেন্দ্রের বাইরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বই আদান-প্রদানের সম্প্রসারিত ব্যবস্থা (ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার / সম্প্রসারণ কেন্দ্র)						
(iv) এ পর্যন্ত কোনও সদস্য-কর্তৃক সর্বাধিক সংখ্যক বইয়ের আদান-প্রদান (০/১-৩/৪-৬/৭-৯/১০-১২/১৩ বা বেশি)						
(v) জনশিক্ষা কেন্দ্রে বই / সংবাদপত্র / সাময়িক পত্র পাঠের ব্যবস্থা						
(vi) কেন্দ্রে নিয়মিত সংগঠিত, লিপিবদ্ধ আলোচনাচক্রের আয়োজন						
(vii) সংগঠিত আলোচনাচক্রে সরকারি / বেসরকারি বিকাশ বিভাগের কর্মীদের অংশগ্রহণ						
(viii) কেন্দ্রে ধারাবাহিকভাবে সাংস্কৃতিক চর্চার আয়োজন						
(ix) কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে খেলাধূলার আয়োজন						
(x) আলোচনাচক্রের / সাংস্কৃতিক চর্চার / খেলাধুলার পরিচালনায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর সহায়তা						
(xi) কেন্দ্রে উন্নয়ন-সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও উন্নয়ন দপ্তরগুলির সঙ্গে যোগাযোগের প্রচেষ্টা						
(xii) কেন্দ্রের কাজে এলাকার মানুষদের অংশগ্রহণ						
(xiii) কেন্দ্রকে আকর্ষণীয় করার জন্য স্থানীয় উদ্যোগ						
সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর						

কেন্দ্রের মুখ্য কাজগুলি রূপায়ণে কী কী ত্রুটি দেখা যাচ্ছে?

সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের গড় :

০	১	২	৩	৪	৫

৩। বাদ ছুটদের সাক্ষরতা-চর্চা সম্পর্কে :

			প্রাপ্ত নম্বর (Score)					
			০	১	২	৩	৪	৫
(i)	সাক্ষরতার স্তরের পড়ুয়াদের প্রাপ্ত নম্বর অনুসারে মান							
	অনুপস্থিতি	মোট ৫০% এর কম						
	মোট ৫০% এর বেশি কিন্তু প্রতিটি বিষয়ে ৫০% নয়	সব বিষয়ে ৫০% বা বেশি, কিন্তু সব মিলিয়ে ৭০% এর কম						
	পড়া-লেখা-অঙ্কে ৫০% এর বেশি এবং সব মিলিয়ে ৭০% - ৮০%	পড়া-লেখা-অঙ্কে ৫০% বা বেশি এবং সব মিলিয়ে মোট ৮১% বা বেশি।						
(ii)	সাক্ষরোত্তর স্তরের পড়ুয়াদের প্রাপ্ত নম্বর অনুসারে মান							
	অনুপস্থিতি	মোট ৫০% এর কম						
	মোট ৫০% এর বেশি কিন্তু প্রতিটি বিষয়ে ৫০% নয়	সব বিষয়ে ৫০% বা বেশি, কিন্তু সব মিলিয়ে ৭০% এর কম						
	পড়া-লেখা-অঙ্কে ৫০% এর বেশি এবং সব মিলিয়ে ৭০% - ৮০%	পড়া-লেখা-অঙ্কে ৫০% বা বেশি এবং সব মিলিয়ে মোট ৮১% বা বেশি।						
		সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর						

	০	১	২	৩	৪	৫
সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের গড় :						

* সাক্ষরতা স্তরের পড়ুয়াদের মোট সংখ্যা কত?
* সাক্ষরোত্তর স্তরের পড়ুয়াদের মোট সংখ্যা কত?
* কেন্দ্রে পড়ুয়াদের নিয়মিত উপস্থিতি কেমন?

৪। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ :

	প্রাপ্ত নম্বর (Score)					
	০	১	২	৩	৪	৫
(i) কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন ও গোষ্ঠীর সক্রিয়তা						
(ii) সহায়ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন / স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার / নবসাক্ষর কর্তৃক নিরক্ষরদের শেখানো / নিজস্ব তহবিল গঠন						
(iii) নির্দিষ্ট লক্ষ্যদল ভিত্তিক ব্যবহারিক কর্মসূচি (সমমান শিক্ষা/আয় বৃদ্ধি/জীবনের গুণমান বৃদ্ধি প্রভৃতি) রূপায়ণের প্রস্তুতি						
(iv) সার্বিক স্বাস্থ্য-বিধানের কাজ (সুলভ শৌচাগার, ধূমহীন চুল্লা, রোগ প্রতিষেধক টিকা ইত্যাদি)						
(v) দ্বিতীয় আর্থিক বছরের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি / অন্যান্য						
সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর						

* কোনও উল্লেখযোগ্য বিষয় :

সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের গড় :

০	১	২	৩	৪	৫

আলোচ্য জনশিক্ষা কেন্দ্রের / মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্রের মান

ক্রমিক সংখ্যা (Sl. No.)	মূল্যায়নের বিষয় (Aspects)	জনশিক্ষা কেন্দ্রের প্রাপ্ত নম্বর (Score 0-5)	বিষয়ের নির্ধারিত মান (Weightage)	মোট প্রাপ্ত মান (Score Weightage)
১।	জনশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন			
ক)	কেন্দ্রের স্থান ও পরিবেশ			
খ)	কেন্দ্রের সাজ সরঞ্জাম		১০	
গ)	বইপত্র ও গ্রন্থাগারের অন্যান্য উপকরণ		১০	
ঘ)	কর্মীবাহিনী ও প্রশিক্ষণ		১০	
২।	মুখ্য কাজগুলি		১০	
৩।	বাদছুটদের সাক্ষরতা চর্চা		৩০	
৪।	অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ		২০	
			১০	
			১০০	

আলোচ্য জনশিক্ষা/মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্রটির অগ্রগতির হার = %
(মোট প্রাপ্ত মান ÷ ৫)

মূল্যায়নকারীর স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট — ২

হুগলি জেলা সার্বিক সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষা প্রসার পর্যদ
চুঁচুড়া : হুগলি

নমুনা কেন্দ্রের মূল্যায়নকারীদের নামের তালিকা

দল	পর্যবেক্ষক ও সহযোগীদের নাম	ব্লক/মিউনিসিপ্যালিটি
১.	অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ সীনা মুখোপাধ্যায় ডাঃ দেবকুমার চট্টোপাধ্যায় সুকুমার ঘোষ পবন মণ্ডল	আরামবাগ, গোঘাট - ১, গোঘাট - ২ পঞ্চায়েত সমিতি এবং আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটি
২.	তরুণ কুমার ভট্টাচার্য ডঃ নিবেদিতা কুণ্ডু গোপাল পাল কার্তিক ঘোষ	খানাকুল - ১, খানাকুল - ২ পঞ্চায়েত সমিতি
৩.	মিহির ঘোষ দস্তিদার, স্বপন ঘোষ জগন্নাথ কুণ্ডু	চণ্ডিতলা - ১, চণ্ডিতলা - ২ এবং জাঙ্গিপাড়া পঞ্চায়েত সমিতি
৪.	সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীপ চৌধুরী অলোক চানক সাহাজাদা মঞ্জর গৌতম সরকার অরুণ দাস	ভদ্রেশ্বর, রিষড়া, উত্তরপাড়া-কোতরং মিউনিসিপ্যালিটি
৫.	অধ্যাপক প্রভাত দত্ত কল্যাণ শতপথী অসিত পাত্র অসিত সিংহ রায় অশোক মান্না অজিত প্রতিহার	তারকেশ্বর, পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতি এবং তারকেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটি

৬. ডঃ জলধর মল্লিক
ডঃ সুভাষ চক্রবর্ত্তী
বলাই সাঁপুই
প্রদীপ সাঁতরা
দেবেশ দে

সিঙ্গুর ও হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতি

৭. শঙ্কর মুখোপাধ্যায়
ডাঃ পি. আর. দাস
অনিমেষ ভট্টাচার্য
লক্ষ্মী নারায়ণ ঘোষ

পোলবা-দাদপুর এবং ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতি

৮. অধ্যাপিকা অনুরাধা চৌধুরী
শিব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
শক্তি মণ্ডল
জীবন মণ্ডল

চুঁচুড়া-মগরা, বলাগড়, এবং পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতি

৯. নন্দিনী কাজুরী
প্রদীপ সাহা
কাজল চক্রবর্তী
পুলক চক্রবর্তী

শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতি এবং শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি

সভাধিপতি এবং সহ-সভাধিপতি, জেলা পরিষদ, জেলা শাসক এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক, হুগলি, জেলা পরিষদের সদস্যরা এবং কোর কমিটির সদস্যরা প্রয়োজনে জেলার যে কোনো কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

জিতেশ রঞ্জন রায় এবং দিবাকর অধিকারী, সেক্রেটারি, জেড. এস. এস এবং ডেপুটি সেক্রেটারি, জেলা পরিষদ-এর তত্ত্বাবধানে জেলার সাক্ষরতা সেলে কাজ করবেন।

পরিশিষ্ট — ৩

(ক) কেন্দ্রগুলির মান অনুসারে তুলনামূলক বিশ্লেষণ :
নমুনা (বাছাই) ও অনমুনা কেন্দ্র ভিত্তিক

ক্রমিক নং	নমুনা/অনমুনা কেন্দ্র	কেন্দ্রের সংখ্যা	প্রাপ্ত নম্বর			
			সাক্ষরতা		সাক্ষরোত্তর	
			৬৯% এর মধ্যে	৭০% এবং উপরে	৬৯% এর মধ্যে	৭০% এবং উপরে
১	নমুনা	৫৫	৪৮%	৫২%	৩৯%	৬১%
২	অনমুনা	২১১৪	৪৭%	৫৩%	৪০%	৬০%

ক্রমিক নং	নমুনা/অনমুনা কেন্দ্র	কেন্দ্রের সংখ্যা	কেন্দ্র ভিত্তিক মূল্যায়ন		
			ভালো নয়	ভালো	খুব ভালো
			৫০%এর মধ্যে	৫১% - ৮০%	৮১% - ১০০%
১	নমুনা	৫৫	১৭%	৫৮%	২৫%
২	অনমুনা	২১১৪	১৫%	৫৯%	২৬%

পাঠকদের মতামত

(১)

'জনশিক্ষা ভাবনা' - এপ্রিল - জুন ২০০৫ সংখ্যাটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে 'বর্ণ পরিচয়' বিশেষ সংখ্যা হিসাবে। বেশ কয়েকটি মননশীল নিবন্ধে সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখার যোগ্য। এজন্য সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বিদ্যাসাগর চরিত' থেকে যে অংশগুলি নির্বাচন করে মুদ্রিত হয়েছে, তা 'বর্ণ পরিচয়'- রচয়িতাকে বুঝতে সাহায্য করবে।

আমরা যারা সাক্ষরতা আন্দোলন থেকে শুরু করে আজকের জনশিক্ষা আন্দোলনে যুক্ত আছি, তাদের কাছে এই পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষরতার তথ্য, প্রশিক্ষণের ধরণ, বর্তমান জনশিক্ষা আন্দোলনে পঞ্চায়েতের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষ কাজে লাগছে। এই আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে যে সমীক্ষামূলক কাজ আপনারা করছেন, তাও আমাদের ভূল-ত্রুটি সংশোধনে সহায়ক হবে। তবে বর্তমান পর্যায়ে কীভাবে কেন্দ্র ভিত্তিক গ্রন্থাগার গড়ে তুলব, কীভাবে আলোচনাচক্র সংগঠিত করব, কীভাবে তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে, কীভাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে বৃত্তিমূলক কাজগুলি করব, সে সম্পর্কে যদি এক একটি সংখ্যায় এক একটি বিষয়কে ধরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকে, তবে তা আমাদের দৈনন্দিন কাজে প্রভূত সাহায্য করবে। জেলায় জেলায় পাঠক-পাঠিকাদের নিয়ে মাঝে মধ্যে সভার আয়োজন করা যায় কিনা, ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

— **অনুরাধা বর্মন**
দীনহাটা, কোচবিহার

(২)

'বর্ণপরিচয়' প্রকাশের দেড়শত বছরে যে ধরনের চর্চা, আলোচনা, অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা প্রকাশের আশা করেছিলাম, বাস্তবে তেমন কিছুই হল না। এতে আশাহত হয়েছি। যে দু-চারটি সংস্থা আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেছে, পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে আপনাদের সংস্থাও। এজন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাই। বিশেষ সংখ্যাটি খুবই ভালো হয়েছে।

এবারের সংখ্যাটিতে ৪৬—৫০ পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে 'সমিতি সংবাদ'। এই সংবাদ পড়ে জানতে পারলাম আপনারা কী ধরনের কাজ করছেন। আপনারা যে হাতে-কলমে 'জনশিক্ষা কেন্দ্র', 'শিক্ষালয়' পরিচালনা করছেন, তা জানতে পেরে উৎসাহিত হলাম। আপনারা যে নবসাক্ষরদের বই, গানের ক্যাসেট প্রকাশ করেছেন, এগুলি জেনেও আনন্দিত হলাম। ইণ্ডিয়ান পাওলো ফ্রেইরি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ড. জালালুদ্দিন প্রমুখের মতো বিদগ্ধ মানুষদের নিয়ে আপনারা যে কাজ করছেন, জনশিক্ষা আন্দোলনে তার কল্যাণকর প্রভাব পড়বেই — এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় হচ্ছে। আমরা এই শুভ প্রয়াসে কীভাবে আপনাদের পাশে থাকতে পারি, তা জানাবেন।

আগের কয়েকটি সংখ্যায় অতীতের জনশিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে পুরোনো লেখা ছাপা হয়েছে। এ ধরনের লেখা মাঝে মধ্যে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি।

— **স্বপন কুমার পাল**
উদয়পুর, ত্রিপুরা

[এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠকদের কাছ থেকে নাতিদীর্ঘ চিঠি আহ্বান করছি।
— সম্পাদকমণ্ডলী, জনশিক্ষা ভাবনা।]

জনগণনা - ২০০১ -এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে সাক্ষরতার হার

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	এলাকা	সাক্ষরতার হার (%) মোট	পুরুষ	নারী
১	কলকাতা	মোট	৮০.৯	৮৩.৮	৭৭.৩
		গ্রামাঞ্চল	-	-	-
		শহরাঞ্চল	৮০.৯	৮৩.৮	৭৭.৩
২	উত্তর ২৪ পরগণা	মোট	৭৮.১	৮৩.৯	৭১.৭
		গ্রামাঞ্চল	৬৯.১	৭৬.৭	৬১.০
		শহরাঞ্চল	৮৫.২	৮৯.৬	৮০.৪
৩	হাওড়া	মোট	৭৭.০	৮৩.২	৭০.১
		গ্রামাঞ্চল	৭২.৮	৮০.৭	৬৪.৫
		শহরাঞ্চল	৬১.০	৮৫.৫	৭৫.৮
৪	হুগলি	মোট	৭৫.১	৮২.৬	৬৭.২
		গ্রামাঞ্চল	৭১.০	৭৯.৭	৬২.১
		শহরাঞ্চল	৮২.৯	৮৭.৮	৭৭.৫
৫	মেদিনীপুর (অবিভক্ত)	মোট	৭৪.৯	৮৪.৯	৬৪.৪
		গ্রামাঞ্চল	৭৩.৯	৮৪.৪	৬৩.১
		শহরাঞ্চল	৮২.৯	৮৯.৪	৭৫.৯
৬	দার্জিলিং	মোট	৭১.৮	৮০.১	৬২.৯
		গ্রামাঞ্চল	৬৬.০	৭৬.১	৫৫.৪
		শহরাঞ্চল	৮৩.৩	৮৭.৭	৭৮.৫
৭	বর্ধমান	মোট	৭০.২	৭৮.৬	৬১.০
		গ্রামাঞ্চল	৬৫.৮	৭৫.০	৫৬.১
		শহরাঞ্চল	৭৭.৪	৮৪.৫	৬৯.৩
৮	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	মোট	৬৯.৪	৭৯.২	৫৯.০
		গ্রামাঞ্চল	৬৭.৪	৭৭.৯	৫৬.১
		শহরাঞ্চল	৭৯.৮	৮৫.৪	৭৩.৭
৯	কোচবিহার	মোট	৬৬.৩	৭৫.৯	৫৬.১
		গ্রামাঞ্চল	৬৪.৩	৭৪.৪	৫৩.৬
		শহরাঞ্চল	৮৫.২	৯০.৪	৭৯.৮

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	এলাকা	সাক্ষরতার হার (%)		
			মোট	পুরুষ	নারী
১০	নদিয়া	মোট	৬৬.১	৭২.৩	৫৯.৬
		গ্রামাঞ্চল	৬১.৮	৬৮.২	৫৫.০
		শহরাঞ্চল	৮১.৪	৮৬.৯	৭৫.৭
১১	দক্ষিণ দিনাজপুর	মোট	৬৩.৬	৭২.৪	৫৪.৩
		গ্রামাঞ্চল	৬০.৪	৬৯.৯	৫০.৩
		শহরাঞ্চল	৮৩.৩	৮৭.৮	৭৮.৫
১২	বাঁকুড়া	মোট	৬৩.৪	৭৬.৮	৪৯.৪
		গ্রামাঞ্চল	৬২.০	৭৫.৮	৪৭.৬
		শহরাঞ্চল	৮০.২	৮৮.১	৭১.৯
১৩	জলপাইগুড়ি	মোট	৬২.৯	৭২.৮	৫২.২
		গ্রামাঞ্চল	৫৮.৯	৬৯.৯	৪৭.২
		শহরাঞ্চল	৮০.০	৮৫.৫	৭৪.১
১৪	বীরভূম	মোট	৬১.৫	৭০.৯	৫১.৬
		গ্রামাঞ্চল	৫৯.৯	৬৯.৫	৪৯.৫
		শহরাঞ্চল	৭৭.৭	৮৪.৭	৭০.২
১৫	পুরুলিয়া	মোট	৫৫.৬	৭৩.৭	৩৬.৫
		গ্রামাঞ্চল	৫৩.২	৭২.৪	৩৩.২
		শহরাঞ্চল	৭৫.৪	৮৫.০	৬৪.৯
১৬	মুর্শিদাবাদ	মোট	৫৪.৩	৬০.৭	৪৭.৬
		গ্রামাঞ্চল	৫২.৩	৫৮.৫	৪৫.৭
		শহরাঞ্চল	৬৮.৩	৭৫.৭	৬০.৭
১৭	মালদহ	মোট	৫০.৩	৫৮.৮	৪১.৩
		গ্রামাঞ্চল	৪৭.৮	৫৬.৬	৩৮.৪
		শহরাঞ্চল	৭৯.৩	৮৪.৪	৭৩.৮
১৮	উত্তর দিনাজপুর	মোট	৪৭.৯	৫৮.৫	৩৬.৫
		গ্রামাঞ্চল	৪২.৯	৫৪.২	৩০.৮
		শহরাঞ্চল	৮০.৫	৮৫.৫	৭৪.৮

[সংকলন : শক্তি মণ্ডল]

দ্বিতীয় বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০৫
Registration No. WBBEN 12125/25/1/2003/PC/171 মূল্য : ১০ টাকা

সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতির পক্ষে দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক সুপারফাস্ট প্রিন্ট, ৩৬৬/সি, জি. টি. রোড (সাউথ), হাওড়া - ৩ হতে মুদ্রিত এবং ২৫/২ বারোয়ারিতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ হতে প্রকাশিত।